দস্যু বনহুর
দুর্গেশ্বরীর জীবন্ত সমাধি
রোমেনা আফাজ
WED 2
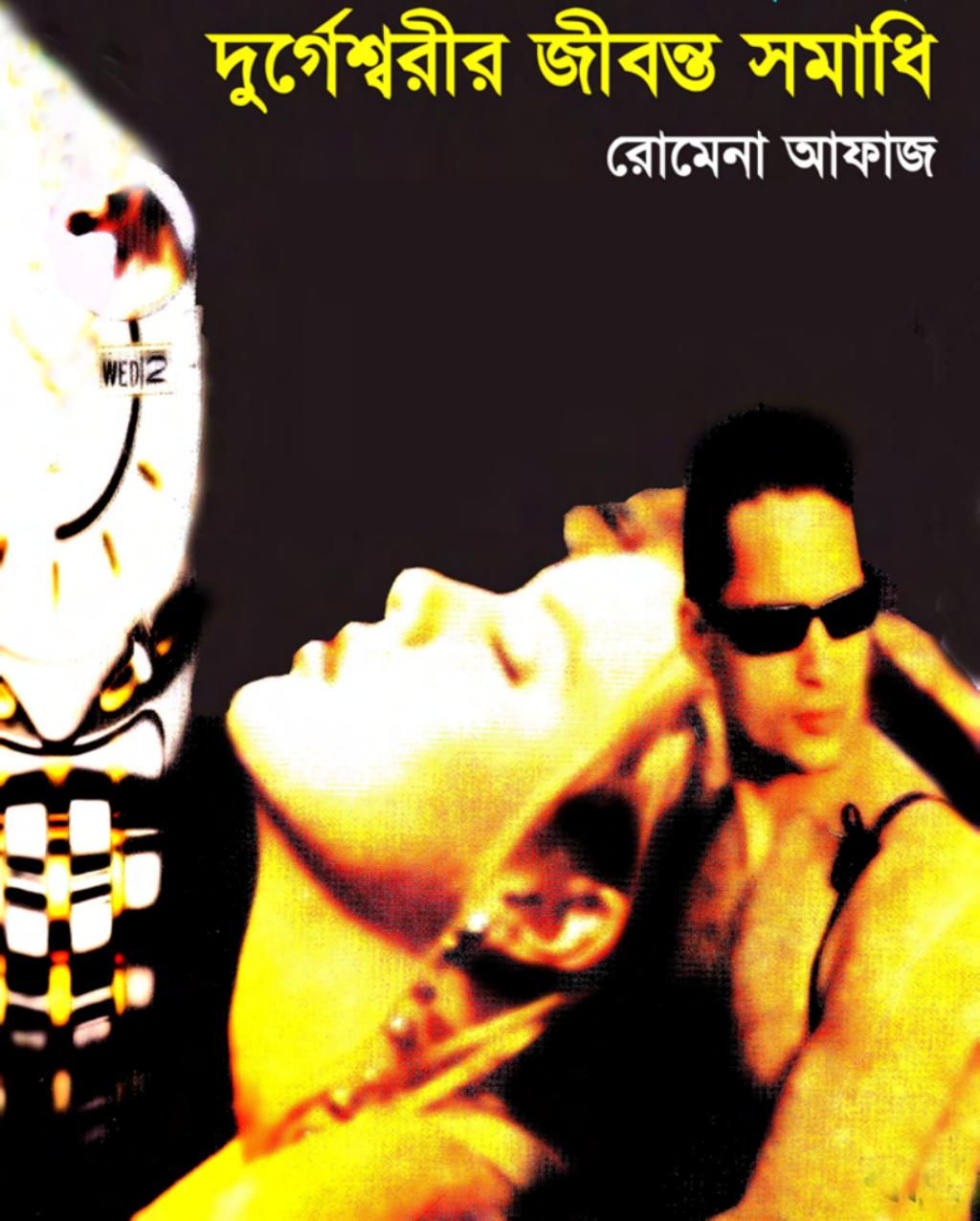
সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

মহারাজ বাসুদেবও চিত্রার্পিতের ন্যায় আড়ষ্ট হয়ে গেছেন। তাঁর চোখেমুখে শুধু বিস্ময়ই নয়, একটা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠেছে।

বনহুর বলে উঠলো—মহারাণী মঙ্গলা দেবীই রাণী দুর্গেশ্বরী। তিনি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বৃদ্ধ মহারাজকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সবই ছিলো তার ছলনা আর অভিনয়। মহারাজকে মিথ্যা প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করে তিনি আর এক জনকে নিয়ে প্রেমের খেলা খেলতেন। সে হলো হরিনাথপুর রাজ্যের রাজপুত্র স্বপনকুমার। স্বপনকুমার যদিও মনে প্রাণে মহারাণীর প্রেম নিবেদন গ্রহণ করতে পারেনি তবু সে পারেনি উপেক্ষা করতে। যদিও সে এ ব্যাপারে বিব্রত বোধ করতো কিন্তু সে নিজেকে সরিয়ে নিতেও পারতো না সহজে, কারণ রাণীর কৃপা ছাড়া এ প্রাসাদে তার স্থান হবে না অথচ তাকে এ প্রাসাদে থাকতেই হবে, না হলে রাণী দুর্গেশ্বরী ও দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

স্তব্ধ হয়ে সবাই বনহুরের কথা শুনে যাচ্ছিলো। একটি সূঁচ পতনের শব্দ শোনা যাবে যেন এমনি নিস্তব্ধ সমস্ত দরবারকক্ষ। রাজপরিষদ এবং অন্যান্যে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা ভাবতেও পারেনি—তাদের মহারাণী মঙ্গলা দেবীই নরহত্যাকারিণী শয়তানী দুর্গেশ্বরী। কারো কণ্ঠ দিয়ে কোনো কথা স্ফুরিত হচ্ছিলো না।

বনহুর বলে চলেছে—স্বপনকুমার রাজপ্রাসাদে স্থানলাভ করেছিলো একমাত্র মঙ্গলা দেবীর অনুগ্রহে। এজন্য তাকে মঙ্গলা দেবীর মন জুগিয়ে চলতে হতো। অনেক সময় তাকেও মহারাণীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে হয়েছিলো এবং সে কারণেই স্বপনকুমার রাজপারিষদ ও অন্যদের দৃষ্টিতে হীনচরিত্ররূপে পরিগণিত হয়েছিলো। রাজপারিষদ এবং অন্যদের চোখে স্বপনকুমার কুৎসিত চরিত্রহীন নগণ্য হলেও মহারাণীর কৃপা ছিলো তার উপর; তাই সকলের ইচ্ছা থাকলেও কেউ তাকে রাজপ্রাসাদ থেকে সরাতে পারেনি। স্বপনকুমার সরল-সহজ-স্বাভাবিক রূপ নিয়ে গোপনে সন্ধান করে

ফিরতো রাণী মঙ্গলা দেবীর আসল রূপ। এজন্য তাকে অনেকবার নাকানি-চুবানি খেতে হয়েছে। কতকটা ইচ্ছা করেই নিজেকে বোকা-হাবা বানিয়ে রেখেছে সে। মঙ্গলা দেবী তার উপরটাই বুঝেছে আর দেখেছে, ভিতরটা বুঝতেও পারেনি, জানতেও পারেনি।

একটু থামলো বনহুর, তারপর আবার বলতে শুরু করলো—মঙ্গলা দেবী মন্ত্রীকন্যা হলেও তার মন ছিলো অত্যন্ত লোভী, সামান্য অর্থ বা ঐশ্বর্যের লোভ নয়, তার লোভ ছিলো বিরাট। গৌরীরাজ্যের অধিশ্বরী হবার বাসনা তাকে উন্মাদ করে তুলেছিলো এবং সে কারণেই সে বৃদ্ধ মহারাজকে স্বামীত্বে বরণ করে নিতেও দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু গৌরী রাজ্যের রাণী হয়েও তার বাসনা পূর্ণ হলো না। আরও পাওয়ার বাসনা তাকে ক্ষিপ্ত করে তুললো। তখন কোনোক্রমে একদিন তার পরিচয় ঘটলো লালারাম নামক এক দস্যুর সঙ্গে। লালারাম মঙ্গলা দেবীর মনোভাব উপলব্ধি করে তাকে নিজ দলের রাণী করার অভিলাষ জানালো। মঙ্গলা দেবী পথ পেলো তার মনস্কামনা চরিতার্থ করার। সে লালারামের দলে যোগ দিয়ে গোপনে দস্যুতা শুরু করলো। সুচতুরা মঙ্গলা দেবী অল্পদিনেই নিজের বুদ্ধিবলে দস্যুরাণীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলো এবং লালারামকে তার সহচর করে নিলো। কিন্তু লালারাম সর্দার তখন নিজের ভুল বুঝতে পারলো। একজন নারীর সহকারী হয়ে থাকতে তার বিবেকে বাধলো। লালারাম যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলো তখন রাণী মঙ্গলা দেবী তার আস্তানার অধিশ্বরী হয়ে বসেছে। আস্তানার প্রত্যেকটি অনুচরকে বশীভূত করে ফেলেছে সে নিপুণ বুদ্ধিবলে।

বনহুর যখন কথাগুলো বলছিলো তখন কারো নিশ্বাস পড়ছে কিনা বুঝা যাচ্ছিলো না। মাঝে মাঝে বনহুর তাকাচ্ছিলো হাত-পায়ে শিকল বাঁধা তার সম্মুখে দণ্ডায়মান দুর্গেশ্বরীর দিকে। বনহুরের মুখের নিচের ভাগ তার পাগড়ীর শেষ অংশ দিয়ে তখনও ঢাকা রয়েছে। এখনও কেউ তার সম্পূর্ণ মুখ দেখতে পায়নি।

মহারাজ বাসুদেবও অত্যন্ত বিস্ময় নিয়ে সব শুনে যাচ্ছেন।

বনহুর বলে চললো—লালারাম নিজে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলো, কিন্তু যখন সে দুর্গেশ্বরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো তখন অনুচরগণ সবাই দুর্গেশ্বরীর হাতের পুতুল বনে গেছে। লালারাম অগত্যা দল থেকে বেরিয়ে

আসতে বাধ্য হলো। সে আবার নতুন দল তৈরি করে দস্যুতা শুরু করলো। আফসোস, তাকে দুর্গেশ্বরী রেহাই দিলো না। একদিন লালারামকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো সে। লালারামকে হত্যা করে দুর্গেশ্বরীর সাহস বেড়ে গেলো চরম আকারে। পথও পরিস্কার হলো, একমাত্র লালারামই জানতো রাণী দুর্গেশ্বরীর আসল পরিচয়। কাজেই তাকে হত্যা করে নিশ্চিন্ত হলো সে। রাজমহিষী সেজে দস্যুরাণী দুর্গেশ্বরী নিজেকে গোপন করে রাখলো রাজ-অন্তঃপুরে। বৃদ্ধ রাজাকে সে মিথ্যা ভালবাসার অভিনয়ে মোহগ্রস্ত করে রাখলো বটে কিন্তু প্রত্যেক রাত্রে সে মহারাজকে নিদ্রায় রেখে আস্তানায় গিয়ে হাজির হতো। আপনারা মনে করবেন এ কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, কারণ মহারাণী রাজ প্রাসাদ থেকে বের হবেন কোন্ পথে? একজনের না একজনের দৃষ্টিতে তিনি ধরা পড়ে যাবেনই যাবেন। কিন্তু দুর্গেশ্বরীর অসাধারণ বুদ্ধি, সে বুদ্ধিবলেই প্রতি রাতে সে বেরিয়ে যেতো রাজপ্রাসাদ থেকে।

দরবারকক্ষের সবাই একবার মুখচাওয়া-চাওয়ি করে নিলেন। মহারাজ যেন হতবাক হয়ে পড়েছেন। চোখের পলক যেন পড়ছে না তাঁর। নিষ্পলক দৃষ্টি নিয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে আছেন জমকালো পোশাক পরা পাগড়ীর আঁচলে মুখঢাকা দস্যু বনহুরের দিকে। কে এই ব্যক্তি যে এতো খবর জানে, রাজ-অন্তঃপুরের সংবাদগুলোও তার অজানা নেই! মহারাজ যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন।

বনহুর দরবারকক্ষের প্রত্যেকের মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো- মহারাণীর কক্ষের মধ্যেই ছিলো এক গোপন সুড়ঙ্গ পথ, সে পথেই মঙ্গলা দেবী বেরিয়ে যেতো রাজপ্রাসাদের বাইরে তার গুপ্ত আড্ডায়। তখন তার দেহে থাকতো জমকালো আলখেল্লা। এ অদ্ভুত আলখেল্লায় মঙ্গলা দেবীর মহারাণী রূপ ঢাকা পড়তো, বিকাশ লাভ করতো রাণী দূর্গেশ্বরী রূপে। লুটতরাজ আর নরহত্যা করেও শান্তি হতো না তার। এমন দিনে তার জীবনে এলো স্বপনকুমার, মহারাণী মঙ্গলা দেবী তাকে পেয়ে বৃদ্ধ মহারাজকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলো। গোপনে স্বপনকুমারের সঙ্গে পরামর্শ হলো—নৌকা ভ্রমণে গিয়ে মহারাজকে ঘুমন্ত অবস্থায় নৌকা থেকে নদীবক্ষে নিক্ষেপ, তারপর স্বপনকুমারকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে যাবে। করলোও তাই—মহারাজকে নদীবক্ষে বিসর্জন দিয়ে ফিরে এলো মহারাণী

রাজ্যে। ঘোষণা করে দিলো, দস্যুগণ মহারাজকে হাত-পা বেঁধে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে। মঙ্গলা দেবী জানে না, মহারাজকে যখন নদীবক্ষে নিক্ষেপ করা হলো তখন তারই নৌকায় স্বয়ং দস্যু বনহুর উপস্থিত ছিলো। সে সকলের অলক্ষ্যে নদীবক্ষ থেকে মৃত্যু মুখো মহারাজকে উদ্ধার করে নিয়ে তুলে নিলো পিছনের নৌকায়।

বনহুরের কথায় দুর্গেশ্বরীর চোখ দুটো যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠলো, দাঁতে দাঁত পিষলো সে। কারণ, দুর্গেশ্বরী জানে, তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে কথা বলছে সে-ই দস্যু বনহুর। তাহলে মহারাজকে এই দস্যু বনহুর নদীবক্ষ থেকে উদ্ধার করে নিয়েছিলো। আর তারই জন্য আজ মহারাজ ফিরে পেলেন তাঁর হারানো সিংহাসন। আর সে হয়েছে বন্দিনী---

দুর্গেশ্বরীর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে।

বনহুর বলে—মহারাজকে দস্যু বনহুর নিজ আস্তানায় নিয়ে যায় এবং সেখানে তাঁকে যত্নসহকারে রাখে। তার পরের ঘটনা সবই মহারাজের জ্ঞাত, কাজেই আমি আর বলতে চাই না। মহারাজ তাঁর সিংহাসন ফিরে পেয়েছেন, ফিরে পেয়েছেন একমাত্র পুত্র মহাদেবকে। আর ফিরে পেয়েছেন রাজ্য এবং পুত্রসম প্রজাগণকে। ফিরে তাকায় বনহুর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজের দিকে, তারপর বলে—মহারাজ, দস্যু বনহুর দুর্গেশ্বরীরূপী মঙ্গলা দেবীকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সাজা দিতে পারতো কিন্তু সে চায় না একটা নারীর দেহে হস্তক্ষেপ করতে। কাজেই দুর্গেশ্বরীর বিচারভার রইলো আপনার উপর। স্বপনকুমার গোরী রাজ্যের মঙ্গল কামনায় রাজপ্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিলো। অনেক সময় রাজপারিষদগণ তার ব্যবহারে হয়তো কষ্ট পেয়েছেন, সেজন্য আপনারা ক্ষমা করবেন---বনহুর এবার খুলে ফেলে নিজের মুখের আবরণ।

সঙ্গে সঙ্গে রাণী দুর্গেশ্বরী অস্ফুট শব্দ করে উঠে—দস্যু বনহুর—তুমিই স্বপনকুমার।

হাঁ মহারাণী, আমিই সেই নগণ্য স্বপনকুমার।

দরবারকক্ষের সকলের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠে। স্তম্ভিত হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন সবাই। তাদের অতি পরিচিত স্বপনকুমারই যে দস্যু বনহুর, একথা তারা যেন ভাবতে পারেন না।

বনহুর মহারাজ এবং কক্ষস্থ সকলকে অভিবাদন জানিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

কয়েকজন সৈনিক সেনাপতির আদেশে দস্যু বনহুরের পিছনে ধাওয়া করতে যায়। মহারাজ তাদের ক্ষান্ত করেন —যেও না তোমরা। দস্যু বনহুর আমার শুধু বন্ধুই নয়, জীবনদাতা।

মহারাজ বাসুদেব এবার মঙ্গলা দেবীর দিকে তাকান।

মঙ্গলা দেবী তখন লৌহশিকলে আবদ্ধ বাঘিনীর মত ফোঁস ফোঁস করছে। অধর দংশন করছে সে। হরিনাথপুরের রাজপুত্র স্বপনকুমার মনে করে সে কতদিন কতভাবে তাকে নিজের করে পেতে চেয়েছে। কত প্রেম নিবেদন সে করেছে ওর কাছে। লজ্জার পরিবর্তে রাগে ক্ষোভে ফুলে উঠে মঙ্গলা দেবী। তার আসল রূপ উদঘাটিত হয়ে পড়ে। রাণী দুর্গেশ্বরীর একটির পর একটি করে মনে হতে থাকে বহু কথা---স্বপনকুমারকে বহু দিন তার কক্ষে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হতো, সে দুর্গেশ্বরীরই চক্রান্তে হয়েছে। কিন্তু কোনোদিন স্বপনকুমার এতে বাধা দেয়নি। মিছেমিছি ঘুমের ভান করে থেকেছে। আজ সব দুর্গেশ্বরীর মনের পর্দায় সচ্ছ হয়ে ফুটে উঠে। হাবা বনে কার্যোদ্ধার করাই ছিলো দস্যু বনহুরের উদ্দেশ্য, দুর্গেশ্বরী তাকে চিনতে পারেনি।

মহারাজের কথায় সম্বিত ফিরে আসে দুর্গেশ্বরীর।

—যাও, ওকে আজ কারাকক্ষে বন্দী করে রাখো, কাল ওর বিচার হবে।

দুর্গেশ্বরী তাকিয়ে দেখে তার চারপাশে অনেক সশস্ত্র সৈনিক অস্ত্র বাগিয়ে ধরেছে। একচুল নড়বার কোনো উপায় নেই।

বাধ্য হলো দুর্গেশ্বরী কারাকক্ষের দিকে পা বাড়াতে। সেদিনের মত দরবার ভঙ্গ হলো।

❑

মহারাজের বিচারে রাণী দুর্গেশ্বরীর মৃত্যুদণ্ড হলো। কারণ দুর্গেশ্বরী শুধু দস্যুতার অপরাধে অপরাধীই নয়, সে মহারাজকে হত্যা করার অপরাধেও অপরাধিনী। কারাদণ্ড বা ফাঁসি তার উপযুক্ত শাস্তি নয়, তাকে জীবন্ত সমাধি

দেওয়াই সাব্যস্ত হলো। রাজগুরু এবং পুরোহিত মহাশয় দুর্গেশ্বরীর এ শাস্তিকে মনেপ্রাণে সমর্থন করলেন।

রাণী দুর্গেশ্বরীকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হবে।

তাকে লৌহশিকলে আবদ্ধ করে কারাগারে বন্দী করে রাখা হলো।

রাণী দুর্গেশ্বরী এতে কোনোরকম উক্তি করলো না। সে জানে, তার অপরাধ কত সাংঘাতিক। মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য, এটা সে নিজেও উপলব্ধি করেছিলো; কিন্তু তাকে যে মহারাজ এভাবে হত্যা করবেন দুর্গেশ্বরী ভাবতেও পারেনি। জীবন্ত সমাধি, —কঠিন মাটির তলায় জমাট অন্ধকারে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু—শিউরে উঠে সে।

শেষ পর্যন্ত দুর্গেশ্বরী মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে একটি অনুরোধ জানালো মহারাজের নিকটে। গোরী রাজ্যের শেষ প্রান্তে হীরা নদের ধারে যেএকটি বিরাট পোড়োবাড়ি আছে ঐ বাড়ির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে যেন সমাধিস্থ করা হয়।

মহারাণীর শেষ অনুরোধ রাখবেন বলে কথা দিলেন রাজা বাসুদেব।

হীরা নদের উপকূল ঘেষে বিরাট রাজপ্রাসাদসম একটি পোড়োবাড়ি। প্রায় হাজার বছর ধরে এ বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে কালের প্রহরীর মত মাথা উঁচু করে। বাড়িটা বহু পুরোন হলেও এখনও সম্পূর্ণ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়নি। শোনা যায়, বহুকাল পূর্বে কোন এক জলদস্যু এ বাড়িটা তৈরি করেছিলো। কিন্তু সে জলদস্যু এ বাড়িতে বেশিদিন টিকতে পারেনি—একদিন গভীর রাতে কে বা কারা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো। পরদিন প্রভাতে অনুচরগণ সর্দারের মস্তকহীন বিকৃত দেহটা শুধু পেয়েছিলো তার শয়নকক্ষে।

এরপর প্রতি রাতেই এক-একজন অনুচর নিহত হতে লাগলো। ঐ একইভাবে হত্যা—দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন।

তারপর এ বাড়িতে থাকার মত কারো সাহস হলো না। দস্যু-ডাকু হলেও তাদেরও তো জীবন, মন-প্রাণ আছে। সবাই সরে পড়লো বাড়িখানা ছেড়ে।

সেই হতে হীরা নদের ধারে জলদস্যু সর্দারের বিরাট বাড়িখানা শূন্য পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভুলক্রমে কোনো লোক এ বাড়িতে আশ্রয় নিলে সে আর পরদিন সূর্যের আলো দেখার সৌভাগ্য লাভ করতো না।

এ জন্যই ভুলেও কেউ কোনোদিন এ পোড়োবাড়ি মুখো হতো না। গোরী রাজ্যের শেষ প্রান্তে নির্জনে হীরা নদের তীরে এই বাড়ি। দূর থেকেই লোকে দেখতো কিন্তু বাড়িখানার নিকটে যাওয়ার সাহস কারো হতো না।

দুর্গেশ্বরী এ বাড়িরই এক নির্দিষ্ট স্থানে তাকে সমাধিস্থ করার জন্য মহারাজের নিকটে অনুরোধ জানিয়েছে।

যেদিন দুর্গেশ্বরীকে সমাধিস্থ করা হবে সেদিন জমকালো পোশাকে আচ্ছাদিত অবস্থায় ঘোড়াগাড়ি যোগে তাকে হীরা নদের পোড়োবাড়িতে আনা হলো। মহারাজ এবং তাঁর বিশ্বস্ত পারিষদগণও এসেছেন এ বাড়িতে আর এসেছে অসংখ্য সশস্ত্র প্রহরী। হঠাৎ যেন কোনো বিপদের সম্মুখীন না হতে হয় এজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন মহারাজ।

দুর্গেশ্বরীর চিহ্নিত স্থানে গভীর গর্ত খননকার্য শুরু হলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই পোড়োবাড়ির মধ্যে একটি বিরাট গর্তের সৃষ্টি হলো।

দুর্গেশ্বরীকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হলো এই গহ্বর মধ্যে।

রাজপারিষদ এবং প্রহরিগণের মনে কিছুটা দয়ার সঞ্চার হলো, কিন্তু মহারাজের এতোটুকু করুণা হলো না, কারণ তাঁকে এই দুর্গেশ্বরীই একদিন হত্যা করতে চেয়েছিলো। সেদিন দস্যু বনহুর যদি তাকে নদীগর্ভ থেকে উদ্ধার না করতো তাহলে পৃথিবীর আলো আর তিনি দেখতে পেতেন না।

রাণী দুর্গেশ্বরীকে জীবন্ত সমাধিস্থ করে ফিরে এলেন মহারাজ বাসুদেব দলবল নিয়ে।

চিরদিনের জন্য মুছে গেলো দুর্গেশ্বরী পৃথিবীর বুক থেকে এক দুর্ধর্ষ দস্যুরাণীর অস্তিত্ব লোপ পেলো লোকসমাজের মন হতে।

গৌরী রাজ্যে শান্তি ফিরে এলো।

আবার প্রজাদের মনে অফুরন্ত আনন্দ উচ্ছ্বাস। সকলের মুখে মুখে মহারাজ বাসুদেবের জয়গান। অসৎ চরিত্রা পাপিষ্ঠা মহারাণীকে তিনি জীবন্ত সমাধিস্থ করেছেন এজন্য সকলেই খুশি হয়েছে মনেপ্রাণে। মহারাজের ন্যায়বিচারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই।

মহাদেবও পুনর্জন্ম লাভ করেছে, ফিরে পেয়েছে পিতাকে। ফিরে পেয়েছে রাজ্য আর তার প্রিয় ভাই-বোনসম প্রজাদের।

গৌরী রাজ্যে আনন্দের বান বয়ে চলেছে। নেই কোনো ভয়-ভীতি আর আতঙ্ক। দস্যু বনহুরের অপরিসীম দয়ায় তারা আজ সর্বপ্রকার বিপদ থেকে মুক্ত।

❑

আস্তানায় ফিরে আসে দস্যু বনহুর।

গৌরী রাজ্য বিপদমুক্ত হওয়ায় দস্যু বনহুরের মনেও এসেছে আত্মতৃপ্তি। কতকটা নিশ্চিন্ত আশ্বস্ত এখন সে। বিশেষ করে দুর্গেশ্বরীর জীবন্ত সমাধির কথা শুনে খুশি হয়েছে বনহুর। পাপিষ্ঠার উপযুক্ত শাস্তিই প্রদান করেছেন মহারাজ বাসুদেব।

ইচ্ছা করলে বনহুরই দুর্গেশ্বরীর সমুচিত শাস্তি প্রদান করতে পারতো। কিন্তু সে নারী হত্যা করাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, তবে বিশেষ কোনো মুহূর্তে এ ব্যাপারে সে নিজেকে সংযত রাখতে পারতো না। তখন তার অস্ত্র উন্মত্ত হয়ে উঠতো দ্বিধাহীনভাবে।

দুর্গেশ্বরীর বিচারের ভার মহারাজের হস্তে অর্পণ করলেও বনহুর রহমানকে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের বেশে রাজপ্রাসাদে রেখে এসেছিলো। শেষ পর্যন্ত মহারাজ যদি দুর্গেশ্বরীর বিচারে কোনো ভুল করে বসেন তখন রহমান যেন সে ভুল সংশোধন করে দিতে সক্ষম হয়।

বনহুর আর রহমান কথা হচ্ছিলো।

বনহুর তার শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বালিশে ঠেশ দিয়ে বসে ছিলো। তার দেহে তখন দস্যুড্রেস, হাতে রিভলভার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো। দৃষ্টি ছিলো তার সম্মুখে, লক্ষ্যহীনভাবে তাকিয়ে ছিলো।

রহমান বলে চলেছে—সর্দার, এতোগুলো সম্পদের সন্ধান জেনেও আমাদের এভাবে নিশ্চুপ থাকা মোটেই উচিত নয়।

হাঁ রহমান, ঠিকই বলেছো, সাপুড়ে সর্দারের সাহায্যে জংলীরাণীর যে সম্পদ আমি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছি তা সত্যিই মহামূল্য, সাত রাজার ধনের চেয়েও অধিক।

তাই বলছিলাম এবার জংলীরাণীর সেই ডুবন্ত সম্পদগুলো উদ্ধার করে আনা হোক। সর্দার, আপনার হুকুম পেলে কাহাতুর পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবার আয়োজন করতে পারি।

বনহুর হস্তস্থিত রিভলভারখানা টেবিলে রেখে সোজা হয়ে বসলো—দু'বছর পূর্বে সাপুড়ে সর্দারের সঙ্গে দিল্লী নগরী থেকে কাহাতুর পাহাড়ের উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকজন রওয়ানা দিয়েছিলাম। আবার আমরা সেই পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবো। সত্যিই আজও আমি ভুলতে পারিনি সেই বৃদ্ধ সাপুড়ে সর্দারের কথা--- বনহুর আনমনা হয়ে যায়।

রহমান নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে থাকে সর্দারের মুখের দিকে। কারণ, সাপুড়ে সর্দার বা কাহাতুর পাহাড় সম্বন্ধে রহমান সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সর্দার যখন দিল্লী শহরে তখন তিনি সাপুড়ে সর্দারসহ কাহাতুর পাহাড়ে গমন করেছিলেন। সর্দারের মুখেই সে শুনেছিলো জংলীরাণী এবং তার ধন সম্পদের কাহিনী। সর্দার আরও বলেছিলেন—রহমান, ঐ অমূল্য সম্পদগুলো উদ্ধার না করা অবধি আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। দেশব্যাপী আমার অগণিত ভুখা ভাই-বোন এক মুঠি অন্নের জন্য হাহাকার করে ফিরছে। এসব ধনসম্পদ যদি উদ্ধার করে আনতে পারি তাহলে আমার অসহায় ভাই-বোনদের যথেষ্ট উপকার হবে। রহমান সর্দারের কথাগুলো স্মরণ করেছিলো, তার মুখে নির্বাক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো—শেষ অবধি সাপুড়ে সর্দারের নির্মম মৃত্যু আমাকে একেবারে মুষড়ে ফেলেছিলো। সেদিন ভাবতেও পারিনি রহমান, আমি সাপুড়ে সর্দারের বাঞ্ছিত সম্পদ আবিষ্কারে সক্ষম হবো। কথাগুলো বলে শয্যায় গা এলিয়ে দিলো বনহুর, তারপর বললো—আয়োজন করো, আগামী সপ্তাহেই আমরা যেন রওয়ানা দিতে পারি। হাঁ, আর একজনের কথা আজ আমার মনে পড়ছে, সে থাকলে অনেক উপকার হতো।

সর্দার, জানতে পারি কি, কার কথা আপনি বলছেন?

হাঁ, নিশ্চয়ই পারো, কেশব—আজ কেশব যদি জীবিত থাকতো তাহলে অনেক উপকৃত হতাম, এ পথ সে চিনে রেখেছিলো।

রহমান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো, সর্দারের ব্যথায় সেও ব্যথিত।

আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলার পর রহমান বিদায় গ্রহণ করলো তখনকার মত।

রহমান চলে যেতেই বনহুর গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লো। জংলীরাণী, সাপুড়ে সর্দার, কেশব—এদের কথা ভেসে উঠতে লাগলো তার মনের পর্দায়।

এমন সময় অতি সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করলো নূরী, পা টিপে টিপে বনহুরের শিয়রে এসে দাঁড়ালো, আলগোছে হাতখানা রাখলো বনহুরের ললাটে।

চমকে উঠলো বনহুর, তারপর খপ করে ধরে ফেললো ললাটে রাখা হাতখানা।

খিল খিল করে হেসে উঠলো নূরী।

বনহুর ওকে টেনে নিলো পাশে, তারপর হেসে বললো— এতোক্ষণ কোথায় ছিলে নূরী?

শিকারে গিয়েছিলাম।

শিকারে?

হাঁ। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

উঁ হুঁ।

আমার ড্রেস দেখেও বুঝতে পারছো না?

কি শিকার করেছো —পশু না মানুষ?

পশু শিকার করা আমার নেশা নয়, মানুষ শিকার করতেই গিয়েছিলাম কিন্তু---

ব্যর্থ হয়েছো, এইতো?

না, নাসরিন আমাকে বাধা দিয়েছিলো।

নূরীর কথায় একটু অবাক হয় বনহুর, কিছুটা সোজা হয়ে বসে বলে—তার মানে?

মানে শোন বলছি, ক'দিন থেকে আস্তানার মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তুমি নেই, সব যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিলো। চারদিকে যেন শুধু মরুভূমি আর হাহাকারে ভরা। তাই নাসরিনকে সঙ্গে করে গিয়েছিলাম শিকারের খোঁজে। উদ্দেশ্য পশুশিকার করা নয়, তোমাদের সন্ধান করা।

হুঁ বুঝেছি। কোথায় গিয়েছিলে শুনি?

তোমার গোরী আস্তানায়। স্বাভাবিক গলায় বললো নূরী।

বনহুর এবার আরও বিস্মিত হলো, সোজা হয়ে বসলো সে শয্যায়, বললো—গোরী আস্তানায় গিয়েছিলে তোমরা? বলো কি নূরী।

হাঁ, বিশ্বাস করো।

আশ্চর্য মেয়ে তোমরা।

আমাদের চেয়ে তোমরা আরও আশ্চর্য, কারণ তোমাদের দু'জনকে চমকে দেবো ভীষণভাবে, এই মনে করে গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে শুনলাম তোমরা কার্যোদ্ধার করে ফিরে গেছো কান্দাই। আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো।

চমৎকার বুদ্ধি তোমাদের নূরী বাহ্‌বা না দিয়ে পারছি না। হঠাৎ যদি কোনো বিপদে পড়তে তাহলে কি হতো?

বিপদে পড়িনি তবে এক মজার ব্যাপার ঘটেছিলো বনহুর। তুমি যদি শুনতে অবাক না হয়ে পারতে না।

আচ্ছা, সব শুনবো, যাও তোমার ঐ শিকারী ড্রেস পাল্টে এসোগে।

নূরী উঠে পড়তে যাচ্ছিলো, বনহুর খপ্ করে ধরে ফেললো ওর হাতখানা, টেনে নিলো নিবিড় করে, তারপর নূরীর কোমল ওষ্ঠদ্বয়ের উপর নিজের পুরু ওষ্ঠদ্বয় রাখলো গভীর আবেগে।

নূরীর রক্তাভ গণ্ড রাঙা হয়ে উঠলো মুহূর্তে। বনহুরের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নির্জীবের মত হয়ে পড়লো নূরী। যদিও সে নিজেকে বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো কিন্তু পারলো না। নিজেও ওর কণ্ঠ বেষ্ঠন করে ধরলো, অভূতপূর্ব আবেশে চোখ দুটো নূরীর বন্ধ হয়ে এলো।

বনহুরের বুকে নিজেকে সমর্পণ করে নূরী তার নারী -জীবনকে স্বার্থক করে নিয়েছে। আজ সে সর্বসুখী, প্রাণ ভরে নূরী অনুভব করে বনহুরের বলিষ্ঠ দেহের উষ্ণ পরশ।

অনেক কষ্টে বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পেলো নূরী, ছুটে বেরিয়ে গেলো সে কক্ষ থেকে।

বনহুর এবার শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, দেহের দস্যু-ড্রেস ত্যাগ করে নাইট ড্রেস পরলো। তারপর প্রবেশ করলো বাথরুমে।

হাত-মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বনহুর বাইরে বেরিয়ে এলো। মুখ থেকে তোয়ালে সরাতেই দেখলো নূরী দাঁড়িয়ে আছে মেঝেতে, একথোকা রজনীগন্ধার মত।

বনহুর তোয়ালেটা আলনার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নূরীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকায় সে নূরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। শিকারী ড্রেস ত্যাগ করে এখন তার দেহে শোভা পাচ্ছে ঘাগড়া, কামিজ আর ওড়না। কিঞ্চিত একরাশ চুল ছড়িয়ে আছে তার ঘাড়ে-পিঠে।

ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলে বনহুরের দিকে তাকায় নূরী। মিষ্টি একটুকরা হাসি ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে।

বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে ডান হাতখানা দিয়ে বলে সে—অপূর্ব!

উঁ হুঁ তুমি, তুমি অপূর্ব। বনহুরের বুকে মাথা রাখে নূরী। বনহুর গভীর আবেগে টেনে নেয় ওকে।

❑

সর্দার, সব কিছু প্রস্তুত। 'শাহী' জাহাজ নিয়েই আমরা রওয়ানা দেবো। যদিও কিছুদিন বেশি সময় লাগবে তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। রহমান বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে কথাগুলো বললো।

বনহুর তখন ড্রেস পরছিলো, কোমরের বেল্টে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা গেঁথে রেখে ফিরে তাকায় রহমানের দিকে। বললো—'শাহী' নিয়ে আমরা কোন্ পথে যাবো সেসব জেনে নিয়েছো রহমান?

হাঁ সর্দার। আমাদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ফারহান আছেন, তিনি পথ চেনেন। তিনিই এ পথের একটা ম্যাপ তৈরি করেছেন, সে পথ ধরে আমাদের জাহাজ তুহানের দিকে যাবে। তুহান থেকে কাহাতুর পাহাড়ের দিকে যেতে হবে।

চলো, কোথায় সেই ম্যাপখানা, দেখতে হবে।

হাঁ সর্দার, আমি সে কারণেই আপনার নিকটে এসেছি। দরবারকক্ষে বৈজ্ঞানিক ফারহান আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

চলো।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে গেলো বিশ্রামকক্ষ থেকে।

দরবারকক্ষে প্রবেশ করতেই বৈজ্ঞানিক ফারহান উঠে অভিবাদন জানালো দস্যু বনহুরকে। বনহুরের কয়েকজন অনুচর ছিলো, তারাও কুর্ণিশ জানালো নত হয়ে।

বনহুর আর রহমান আসনে এসে উপবেশন করলো। বৈজ্ঞানিক ফারহান বসলো তাদের সম্মুখে। যে ম্যাপখানা সে তৈরি করেছিলো সেটা বনহুরের সামনে মেলে ধরলো।

ঝুঁকে পড়লো বনহুর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো।

রহমানও দেখতে লাগলো মনোযোগ সহকারে।

অনেকক্ষণ ধরে দেখার পর বনহুর বললো—ফারহান, তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তুমি যেভাবে ম্যাপখানা তৈরি করেছো তাতে মনে হয় একেবারে নির্ভুল পথ আবিষ্কার করেছো। চমৎকার হয়েছে।

রহমান সর্দারের কথায় খুশি হলো, এবার সেও নিশ্চিন্ত হলো ম্যাপখানা সম্বন্ধে।

পরদিন যাত্রার আয়োজন করা হলো।

নূরী ধরে বসলো সেও যাবে বনহুরের সঙ্গে।

কিন্তু বনহুর এতে মোটেই রাজি নয়, কারণ তারা নানা বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। অনেকগুলো দিন তাদের জাহাজে কাটাতে হবে।

বনহুর নূরীকে সঙ্গে নিতে রাজি না হওয়ায় কেঁদে কেটে আকুল হলো। নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিলো সে।

অভিমান ভরে বসে রইলো মুখ ভার করে।

বনহুর নিজে গিয়ে 'শাহী' জাহাজে সব পরীক্ষা করে দেখে নিলো, প্রয়োজনীয় সব উঠেছে কিনা।

রহমান সবই গুছিয়ে নিয়েছে। খুশি হলো বনহুর।

কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ছাড়াও সশস্ত্র প্রহরী রইলো প্রায় পঞ্চাশের বেশি। নানারকম অস্ত্র, গোলাগুলি, অটোম্যাটিক মেশিন গান, ওয়্যারলেস, বাইনোকুলার এবং পাওয়ারফুল টেলিভিশনও রয়েছে 'শাহী' জাহাজে। 'শাহী' জাহাজের খোলের মধ্যে রইলো বনহুরের অনুচরগণ। মধ্যের ক্যাবিনটা স্বয়ং দস্যু বনহুরের জন্য। পাশের ক্যাবিনগুলোয় বনহুরের বিশ্বস্ত অনুচরগণ থাকবে, আর একটিতে থাকবে পথ-প্রদর্শক বৈজ্ঞানিক ফারহান।

রহমান একেবারে জাহাজের সম্মুখের ক্যাবিনে থাকবে। এসব রহমানই গুছিয়ে নিয়েছে নিজের পছন্দমত।

সর্দারকে রহমান এবার সম্মুখের ক্যাবিনে থাকতে দিতে রাজি নয় কারণ কখন আচম্‌কা কোন্ বিপদ এসে পড়ে কে জানে। সর্দারকে প্রথমেই যেন বিপদের সম্মুখীন হতে না হয় এ কারণেই রহমান বেছে নিয়েছে এ ক্যাবিনটা নিজের জন্য।

বনহুর অবশ্য এতে প্রবল আপত্তি তুলেছিলো রহমান তার কথা কানে নেয়নি।

শেষ পর্যন্ত বনহুর নিশ্চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছিলো।

বনহুর রওয়ানা দেবার পূর্বে নূরীর সন্ধান করলো। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু বনহুর নয় রহমানও খুঁজে পাচ্ছে না তার প্রিয়তমা স্ত্রী নাসরিনকে।

কাজেই, শাহী বন্দর ত্যাগ করায় বিলম্ব হতে লাগলো।

বনহুর আর রহমানই শুধু চিন্তিত হলো না, আস্তানার সবাই গভীর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হলো। হঠাৎ কোথায় গেলো নূরী আর নাসরিন!

এদিকে সব আয়োজন হয়ে গেছে, যাত্রার সময় আগত প্রায়।

রহমান ব্যস্ত হয়ে নূরী এবং নাসরিনকে খুঁজে চলেছে।

বনহুর রহমানকে ডেকে বললো—ওরা থাক, তুমি রওয়ানা দেবার জন্য তৈরি হয়ে নাও রহমান।

রহমান কিছু বুঝতে না পেরে নিশ্চুপ রইলো। যদিও নাসরিন আর নূরী আস্তানার মধ্যেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে তবুও যাবার সময় একবার দেখা হলে ভাল হতো। রাতের কথাটা মনে হলো রহমানের, নাসরিন তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলো—এবার তোমাকে একা যেতে দেবো না কিন্তু।

রহমান হেসে বলেছিলো—একা কোথায়—সর্দার আছে, আমাদের অনুচরগণ আছে, আরও আছে 'শাহী'র বহু মাঝি মাল্লা।

তা নয়, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে বলেছিলো নাসরিন। আমাকে তুমি ছেড়ে যেতে পারবে না কিছুতেই। এসব ভাবছে রহমান, বনহুর হেসে বলে- ওদের সঙ্গে নেওয়া হবে না বলেই অভিমানে কোথাও লুকিয়ে আছে। চল রহমান।

মনে একটা অস্বস্তি বোধ করলেও বনহুরকে অনুসরণ করলো রহমান।

বনহুরের মনে আর একটা বাসনা জেগে উঠলো। মনিরা আর নূরের সঙ্গে দেখা না করে যাওয়াটা যেন কেমন অস্বস্তিকর লাগছিলো।

এ ক'দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় কান্দাই শহরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আস্তানায় বহু কাজ জমা হয়ে ছিলো, আরও কাজ ছিলো তার অস্ত্রাগারে। নতুন একটা অস্ত্রাগার তৈরি করেছে বনহুর, তাই নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলো সে।

তাছাড়া তুহান রওয়ানা দেওয়ার জন্য নানারকম ব্যাপারে বনহুরকেও সব সময় কাজে লিপ্ত থাকতে হতো। মনিরার কথা যে তার মনে পড়েনি তা নয়, মনে পড়েছে নূরের কথাও। কিন্তু যাবার সুযোগ করে উঠতে পারেনি বনহুর।

আজ যখন জাহাজ 'শাহী' অভিমুখে পা বাড়াবে তখন মনটা কেমন যেন আনমনা হয়ে উঠলো। বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—রহমান, আমি একবার মনিরার সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

রহমান এ কথাটাই বলবে বলে ক'দিন থেকে ভাবছিলো কিন্তু সর্দারকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখে বলতে সাহসী হয়নি সে। তবে রহমান নিজে দেখা করে এসেছে একদিন গিয়ে। মনিরাকে বলেছিলো—বৌরাণী, সর্দার ভালই আছেন, তবে নানা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। সময় পেলেই আসবেন।

সে আজ কয়েকদিনের কথা।

আজ পর্যন্ত সর্দার বৌরাণীর ওখানে যায়নি একটিবারের জন্য, এটা তার কাছে কেমন যেন অস্বস্তিকর লাগছিলো। নূরীও বলেছিলো কয়েকবার, মনিরার ওখানে গিয়ে একবার দেখা করে এসো।

শুধু আজ নয়, নূরী সবসময় মনিরার কথা স্মরণ করিয়ে দিতো বনহুরকে। সেদিন নূরী যখন বনহুরের জামার বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে বলেছিলো—মনিরার সঙ্গে দেখা করে এসোগে, যাও হুর। বলো, আজ তুমি যাবে?

বনহুর হেসে বলেছিলো—যাবো। কিন্তু অনেকগুলো কাজ আমার ঘাড়ে জমা হয়ে গেছে যার জন্য মনকে শক্ত করে রাখতে হয়েছে। তবে সুযোগ পেলেই যাবো।

সত্যি যাবেতো?

হাঁ, বলছি হাঁ। সেদিন আরও বলেছিলো বনহুর—আচ্ছা নূরী মনিরার কাছে আমাকে পাঠাতে পারলে তুমি বেঁচে যাও, তাই না? তোমার কি একটুও হিংসা হয় না নূরী?

উঁ হুঁ মোটেই না।

কারণ?

কারণ, তুমি তো মনিরা আপার সম্পদ। তোমাকে পেয়েছি এটাই যে আমার জীবনে পরম গৌরব। তোমাকে সম্পূর্ণভাবে ধরে রাখার মত সাহস আমার নেই, হুর। বেশি লোভ করতে গিয়ে যদি একেবারে তোমাকে হারাই সেই ভয় আমার মনকে সবসময় দুর্বল করে রাখে।

বনহুর নূরীর কথায় খুশি হয়েছিলো, সত্যিই নূরীর উপরটা শুধু সুন্দর অপূর্ব নয়, তার মনটাও অপূর্ব সুন্দর। বনহুর স্তব্ধ হয়ে শুনেছিলো নূরীর কথাগুলো।

বনহুর যখন বললো, রহমান, আমি কান্দাই যেতে চাই। 'শাহী' বন্দর ত্যাগ করার পূর্বে মনিরা ও নূরের সঙ্গে দেখা করা দরকার। তখন রহমান সর্দারের কথায় আনন্দে আপ্লুত হলো, বললো সে—একান্ত দরকার সর্দার। বৌরাণী আপনার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন।

মৃদু হেসে বললো বনহুর—তুমি তাহলে গিয়েছিলে সেখানে?

হাঁ সর্দার, গিয়েছিলাম। বৌরাণী কিন্তু আপনার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। বিশেষ করে অনেকদিন হলো আপনার আম্মা আপনাকে দেখেননি তাই তিনি নাকি বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

রহমানের মুখে মায়ের কথা শোনার পর বনহুরের বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস, বলে সে—রহমান, তাজকে প্রস্তুত করতে বলো, আমি কান্দাই যাবো।

রহমান তাজকে প্রস্তুত করার আদেশ দিতে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর কিছু চিন্তা করতে লাগলো, নূরী গেলো কোথায়। নাসরিনেরই বা কি হলো। আপন মনেই হাসলো বনহুর।

অল্পক্ষণ পর রহমান ফিরে এলো—সর্দার, তাজ প্রস্তুত।

বনহুর মুহূর্তে বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেলো। রহমানও অনুসরণ করলো তাকে।

সর্দারের সঙ্গে তাজ অবধি এগিয়ে এলো রহমান।

বনহুর তাজের পাশে এসে দাঁড়াতেই, তাজ আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো—চিঁহি---

বনহুর তাজের গলায় মৃদু আঘাত করলো হাত দিয়ে। তারপর এক লাফে উঠে বসলো তাজের পিঠে।

রহমান এবং আরও দু'জন অনুচর দাঁড়িয়েছিলো তাজের দু'পাশে। তারা কুর্ণিশ জানিয়ে সরে দাঁড়ালো।

বনহুর তাজের পিঠে চেপে লাগাম টেনে ধরতেই তাজ উল্কা বেগে ছুটতে শুরু করলো।

চৌধুরী বাড়ির নিকটে পৌছে বাগানের ওপাশে তাজকে রেখে বনহুর এগিয়ে এলো। তখনও বেলা ডুবে যায়নি। চৌধুরী বাড়ির আনাচে-কানাচে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসেনি। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো বনহুর কেউ নেই। হঠাৎ তার দৃষ্টি বাগানের মধ্যে চলে গেলো। দেখতে পেলো, মনিরা বসে আছে, সম্মুখে ফাঁকা জায়গাটায় একটা বল নিয়ে খেলা করছে নূর।

মনিরা মাঝে মাঝে হাত তালি দিয়ে পুত্রকে বল খেলায় উৎসাহী করে তুলছিলো।

বনহুর গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ালো নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো স্ত্রী এবং পুত্রের দিকে। বল ছুঁড়তে গিয়ে নূর হাঁপিয়ে পড়ছিলো বলে হাসছিলো মনিরা।

বনহুরও হাসছিলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ নূরের নজর গিয়ে পড়লো অদূরে দণ্ডায়মান বনহুরের উপর।

নূর আনন্দধ্বনি করে উঠলো—আম্মি, দেখো দেখো চাঁদ এসেছে। চাঁদ এসেছে---

মনিরা চমকে উঠে তাকালো সম্মুখে, বলল—চাঁদ কে বাবা?

যাঃ চাঁদকে চেনো না? সেই যে আমাকে ছেলেধরাদের কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছিলো।

হাঁ মনে পড়েছে-----দীপ্ত হয়ে উঠলো মনিরার মুখমণ্ডল। দ্রুত পুত্রের পাশে এসে তাকালো সম্মুখে।

ততক্ষণে বনহুর বাগানে প্রবেশ করে এগিয়ে আসছে এদিকে।

নূর ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো বনহুরের একখানা হাত, আনন্দ ভরা কণ্ঠে বললো—চাঁদ, চাঁদ তুমি এসেছো?

বনহুর নূরকে তুলে নিলো কোলে, ততক্ষণে মনিরার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো বনহুরের। বললো বনহুর—নূর, তোমাকে দেখতে এলাম। কেমন আছো?

নূর বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে বললো—আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছো চাঁদ?

খুব ভাল আছি। কথার ফাঁকে আর একবার বনহুর মনিরার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলো।

অভিমানে মনিরার মুখ ভার হয়ে এসেছে। সে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সে স্বামীর মুখমণ্ডলে। বনহুর যখন বললো, 'খুব ভাল আছি' তখন মনিরা ক্রুদ্ধভাবে মাথাটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো।

বনহুর বুঝতে পারলো, মনিরা তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছে। হাসলো বনহুর।

নূর বললো—খুব ভাল ছিলে তবে এতোদিন আসোনি কেন?

কি যে জবাব দেবে চট্ করে বলতে পারলো না বনহুর, একটু ভেবে নিয়ে বললো—অনেক দূরে থাকি কিনা তাই আসতে পারি না। আমাকে তুমি মাফ্ করে দাও নূর।

বনহুর কথাগুলো যে শুধু নূরকে লক্ষ্য করেই বলেনি তা বেশ বুঝতে পারলো মনিরা। মুখটা তুলে একবার তাকাতেই দেখলো বনহুর নূরের পাশ দিয়ে তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

নূর পুনরায় প্রশ্ন করে বসলো—না, আমি তোমাকে কিছুতেই মাফ্ করে দেবো না চাঁদ। বলো, এখন থেকে তুমি রোজ আসবে?

আমার যে অনেক কাজ।

আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো নূর বনহুরের গলা, বললো—কি এতো কাজ তোমার চাঁদ?

অনেক কাজ, সে তুমি বুঝবে না?

বলো, আমি সব বুঝতে পারবো। বলো না চাঁদ?

এবার বনহুর বিপদে পড়লো, পুত্রের কাছে মিথ্যা বলতে মন তার চাইলো না।

মনিরা বুঝতে পারলো, তার স্বামী বেশ ঘাবড়ে গেছে। বললো তাই—নূর তুমি বড্ড দুষ্টো হয়েছো। নেমে এসো, নেমে এসো ওর কোল থেকে।

নূর মায়ের কথার অবাধ্য নয়, সে তৎক্ষণাৎ নেমে পড়লো, এগিয়ে এলো মায়ের পাশে, বললো—আম্মি, চাঁদের সঙ্গে তুমি কথা বলছো না কেন? ওকে বসতে বলছো না কেন?

ওকে আমি চিনি না। চলো নূর বাড়ির ভিতরে যাই। গম্ভীর গলায় বললো মনিরা কথাগুলো।

সেকি! আম্মি তুমি ওকে চেনো না? চাঁদ, চাঁদকে চেনো না তুমি? ঐ যে একদিন ও আমাকে---

থাক্ অতো বলতে হবে না। আমি ওসব শুনতে চাই না। মনিরার গম্ভীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। এসো ভিতরে যাই।

চাঁদকে ডাকলে না আম্মি? বললো নূর।

যাকে চিনি না তাকে ডাকবো কেন বলো?

বনহুর হাসিমুখে---বললো—নূর, তোমার আম্মি ঠিকই বলেছেন, আমাকে তো উনি চেনেন না।

তুমি বড্ড ভুলে যাও আম্মি। আর একদিন ওর সঙ্গে তুমি কত কথা বলেছিলে। আমাদের বাড়ির মধ্যে গিয়েছিলো ও---

হঠাৎ বনহুর বলে উঠে—নূর, অত্যন্ত পিপাসা বোধ করছি, আমাকে একটু পানি খাওয়াবে?

পানি খাবে চাঁদ?

হাঁ নূর বড্ড পিপাসা---

তুমি অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুণি পানি এনে দিচ্ছি। নূর একছুটে চলে গেলো বাড়ির দিকে।

নূর চলে যেতেই বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে, বলিষ্ঠ হাতে মনিরার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলে—তুমি কি জানোনা মনিরা, আমি ইচ্ছা করে আসতে বিলম্ব করি না। তুমি আমায় মাফ করো---

মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফল হলো না, একচুল শিথিল হলো না ওর হাত দু'খানা।

মনিরা বললো—তুমি এভাবে আর এসো না। আমি চাই না তোমাকে।

মনিরা তুমি তো সব জানো। কেন আমার উপর তুমি রাগ করো বলোতো? জেনেশুনেও যদি অবুঝ হও তবে আমি কি করবো বলো?

আর এসো না তাহলেই আমি বেশি খুশি হবো।

মনিরা।

হাঁ, তুমি আর এসো না।

বনহুরের হাত দু'খানা ধীরে ধীরে খসে আসে মনিরাকে মুক্ত করে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। একটা গভীর ব্যথার ছাপ ফুটে উঠে তার চোখেমুখে।

এমন সময় নূর এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এসে পড়ে সেখানে—চাঁদ, পানি নাও।

বনহুর আনমনা হয়ে পড়েছিলো, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নূরের হাত থেকে পানির গ্লাসটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পান করে। তারপর পানির খালি গ্লাসটা নূরের হাতে দিয়ে বলে—নূর, এবার চলি?

নূরের মুখখানা গম্ভীর হয়ে পড়ে মুহূর্তে, পানির খালি গেলাসটা বাগানস্থ পাথরাসনের পাশে রেখে বনহুরের হাতখানা ধরে ফেলে—এক্ষুণি যেতে দেবোনা তোমাকে চাঁদ।

নূর, তোমার কথায় তো থাকতে পারি না।

ও বুঝেছি, আম্মি তোমাকে থাকতে বলেনি, তাই তুমি চলে যেতে চাইছো? নূর মায়ের কাছে গিয়ে বলে—আম্মি, তুমি ওকে থাকতে বলো, তাহলে চাঁদ থাকবে। আম্মি, তুমি ওকে থাকতে বলো---

না, আমি থাকতে বলবো না। ওকে যেতে দাও নূর।

কথাটা বলে মনিরা দ্রুত চলে গেলো অন্তঃপুরের দিকে। বনহুর নির্বাক দৃষ্টি মেলে মনিরার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

নূর বললো—চাঁদ, আম্মি চলে গেলো বলে তুমি কিছু মনে করো না। সত্যি আম্মিটা যেন কেমন।

না, আমি কিছু মনে করিনি নূর। চলো ওখানে বসি গিয়ে।

বনহুর নূরসহ পাথরাসনে বসে পড়লো।

নূরকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ওর কপালে চুমু দিলো বনহুর।

নূর বললো—চাঁদ, তুমি আমাকে কত ভালবাস। সত্যি তোমাকে দেখলে আমার আব্বুর কথা মনে হয়।

চমকে উঠলো বনহুর নূরের কথায়। চোখ দুটো অকস্মাৎ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। গভীর স্নেহে বুকের মধ্যে টেনে নিলো নূরকে।

নূর কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হলো, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলো, চাঁদ তাকে খুব ভালবাসে, তাই এতো স্নেহ করে। বললো নূর—সত্যিই চাঁদ, আমিও তোমাকে অনেক ভালবাসি।

সত্যি। সত্যি বলছো নূর? আমাকে তুমি ভালবাসো?

হাঁ, তোমাকে আমি অনেক ভালবাসি। তুমি কেন আসো না বলো?

এবার থেকে আসবো। আসবো নূর।

তোমার বাড়ি কোথায়?

অনেক দূরে।

আমাকে একদিন নিয়ে যাবে তোমার বাড়িতে?

যাবো। কিন্তু তোমার আম্মি আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে দিলে তো যাবে?

আম্মিকে আমি বলবো।

আচ্ছা বলো।

চলো না চাঁদ, আমার দাদী আম্মার সঙ্গে দেখা করবে?

হাঁ, তোমার দাদী আম্মার সঙ্গে দেখা করবো।

তবে চলো আমার সঙ্গে। নূর বনহুরের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে হলঘরের দিকে।

বনহুরকে হল ঘরে বসিয়ে ছুটে গেলো নূর ভিতর বাড়িতে—দাদী আম্মা, দাদী আম্মা---·---

মরিয়ম বেগম তখন কোনো কাজ করছিলেন, নূরের কণ্ঠস্বরে তিনি জবাব দিলেন—নূর, আমি এখানে।

নূর দাদী আম্মার কক্ষে প্রবেশ করে বললো, দাদী আম্মা—চাঁদ এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

চাঁদ? কে সে? মরিয়ম বেগম চাঁদের কথাটা ভুলেই গেছেন সম্পূর্ণভাবে।

নূর বললো—তুমিও চাঁদকে চিনতে পারছো না দাদী আম্মা? সেই যে আমাকে ছেলেধরার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলো।

বলিস কি নূর সেই চাঁদ এসেছে? মনির, আমার মনির এসেছে---

কে, কে তোমার মনির দাদী আম্মা? অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো নূর।

মরিয়ম বেগম তখন ডাকতে শুরু করেছেন—মা মনিরা, মনিরা, কোথায় তুই। শুনেছিস্ মনির এসেছে, মনির---

মনিরা বেরিয়ে আসে নিজের কক্ষ থেকে, গম্ভীর গলায় বলে—তুমি যাও মামীমা। আমি যাবো না।

সেকি মা, আয় মনির রাগ করে চলে যাবে যে।

যেতে দাও মামীমা। যাকে কোনো দিন ধরে রাখতে পারবো না কেন তাকে ধরে রাখার বৃথা চেষ্টা।

নূর দাদী আম্মা আর আম্মির কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। মনির কে দাদী আম্মা কার কথা বলছেন।

মরিয়ম বেগম আর নূর হলঘরে এসে দেখলো কেউ নেই।

নূর তাকালো শূন্য আসনটার দিকে, যে আসনে চাঁদকে সে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলো।

মরিয়ম বেগম অনেক আশা আর বাসনা নিয়ে ছুটে এসেছিলেন হলঘরে, এক্ষণে ঘরে কাউকে না দেখে বিষন্ন হয়ে গেলো তাঁর মুখমণ্ডল।

নূর বললো—চাঁদ এখানেই বসেছিলো, কোথায় চলে গেলো?

নূর বেরিয়ে গেলো চাঁদের অন্বেষণে।

মরিয়ম বেগম আঁচলে অশ্রু মুছতে মুছতে হলঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়াতেই পিছন থেকে ভেসে আসে তার আকাঙ্খিত কণ্ঠস্বর—মা। মাগো।

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালেন মরিয়ম বেগম। পুত্রের মুখে দৃষ্টি পড়তেই তাঁর মুখমণ্ডল দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, আনন্দ আপ্লুত কণ্ঠে বললেন—মনির।

মা। আমাকে ঐ নামে এখন ডেকো না মা। বিশেষ করে নূরের সামনে আমাকে তুমি চাঁদ বলেই ডেকো।

ওরে এতোবড় পাষণ্ড তুই হলি কি করে? কেঁদে কেঁদে আমার দু'চোখ অন্ধ হয়ে গেলো আর তুই এমনি করে চিরদিন দূরে থাকবি।

মা, মাগো, এ কথা বলে কেন তুমি আমাকে বারবার কষ্ট দাও। তুমি তো জানো, সব জানো মা। তুমি জানো, তোমার পুত্র স্বাভাবিক মানুষ নয়।

কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না বাবা। তোকে ছাড়া মনিরা বাঁচবে কি করে বল্? সব সময় মার আমার মুখ কালো হয়ে থাকে, হাসি নেই, খুশি নেই—নেই কোনো আনন্দ। এই কচি বয়সে মা একেবারে যেন বুড়িয়ে গেছে।

এ কথা তো তুমি জানতে মা। জেনে শুনে কেন এমন ভুল করেছিলে? সেজন্য দায়ী আমি নই---একটু থেমে গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর—মনিরা বলেছে, সে আমাকে চায় না। আমাকে সে আসতে বারণ করে দিয়েছে।

মনির, মনির, এ তুই কি বলছিস বাবা?

হাঁ, আর আমি আসবো না।

আমি তাহলে আত্মহত্যা করবো।

মা!

অনেক ব্যথা দিয়েছিস্ তারপর যদি আরও ব্যথা দিস তবে আত্মহত্যা ছাড়া আমার কোনো গতি নেই। মনিরার চোখের পানি আমার সমস্ত মন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আব আমি এসব দেখতে পারবো না, তার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো।

মা। মাগো কি করতে বলো আমাকে?

এখন সংসারী হয়ে সুখের সংসার গড়ে তোল, তাহলে আমি সুখী হবো, শান্তি নিয়ে মরতে পারবো।

কিন্তু---

কোনো কিন্তু আমি শুনতে চাই না। আজই আমি নূরের কাছে সব বলে দেবো। বলে দেবো তুই ওর আব্বু--

একি বলছো মা? নূর জানবে--- না না, তা হয় না, তা হয় না মা।

হবে, বাপ হয়ে চিরদিন ছেলের কাছে আত্মগোপন করে থাকবি---

এমন সময় নূর কক্ষে প্রবেশ করে সব শুনে ফেলে, চাঁদকে দেখে খুশি হয়েছে আবার দাদীর কথা শুনে অবাকও হয়েছে।

বনহুর বিব্রত হয়ে উঠে।

মরিয়ম বেগম বলেন—নূর জানিস্ চাঁদই তোর আব্বু।

নূর বিস্ময়ভরা নয়নে তাকায় দাদী আম্মা আর চাঁদের দিকে, যেন তার মাথায় ঢুকছে না।

বনহুরের মুখে কোনো কথা নেই।

মনিরা কখন যে মরিয়ম বেগম আর নূরের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ বুঝতে পারেনি।

নূর অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো—চাঁদ আমার আব্বু?

মনিরা পিছন থেকে বলে উঠে—হাঁ, নূর চাঁদ তোমার আব্বু।

আম্মি, আম্মি সত্যি বলছো?

হাঁ বাবা সত্যি।

নূর ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে—আব্বু। তুমি আমার আব্বু।

বনহুর পারে না স্থির থাকতে, নূরকে তুলে নেয় কোলে, জাপটে ধরে বুকের মধ্যে নিবিড় স্নেহে।

মরিয়ম বেগমের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা মুখে ফুটে ওঠে তৃপ্তির হাসি। আজকের মত বুঝি আনন্দ তাঁর কোনো দিন হয়নি।

মনিরার মুখ দীপ্ত হাস্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে যা চেয়েছিলো তাই হলো। বিশেষ করে নূরের কাছে বাপ হয়ে আত্মগোপন করে থাকতো—এই বড় অসহ্যনীয়। তাছাড়া হঠাৎ যদি কোনো দিন নূর তার আম্মিকে চাঁদের পাশে ঘনিষ্টভাবে দেখে ফেলে তখন যে একটা অবিশ্বাসের ছায়াপাত হবে তার কচিমনে তা কোনোদিন মুছে যাবে না। মনিরা যেন আজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

বনহুরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মনিরার মুখে মৃদু হাসির আভাস দেখা দেয়।

বনহুর বুঝতে পারে মনিরার মন থেকে সব রাগ, —অভিমান মুছে গেছে। আজ এমন একটা ঘটনা ঘটে বসবে ভাবতেও পারেনি বনহুর। কারণ সে চেয়েছিলো চিরদিন পুত্রের কাছে সে আত্মগোপন করে থাকবে।

নূর এবার যখনই শুনলো চাঁদই তার আব্বু তখন তার খুশির অন্ত রইলো না। অবাক হয়ে দেখতে লাগলো তার হারানো পিতাকে।

মরিয়ম বেগম বললেন—চল্ বাবা, উপরে চল্। মনিরা ওকে নিয়ে আয় মা সঙ্গে করে।

মরিয়ম বেগম পুত্রের খাবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ছুটলেন রান্নাঘরের দিকে।

মনিরা ডাকলো—এসো।

নূর বনহুরের কোল থেকে নেমে মাকে লক্ষ্য করে বললো আম্মি, চাঁদ আমার আব্বু হয় এ কথা কেন এতোদিন বলোনি?

মনিরা কোনো জবাব দেবার পূর্বেই বলে উঠে বনহুর, তোমাকে হঠাৎ একদিন চমকে দেবো বলে আমিই তোমার আম্মিকে বারণ করে দিয়েছিলাম।

ওঃ এবার বুঝেছি। আব্বু, তুমি বড্ড চালাক কিন্তু, এবার থেকে নিজেকে লুকোতে পারবে না আর।

বনহুর, মনিরা আর নূর সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

নূরের আনন্দ আর ধরছে না, সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ছুটে চললো ফুল মিয়া আর সরকার সাহেবকে সংবাদটা জানাতে তার আব্বু এসেছে কম কথা নয়।

বনহুর আর মনিরা প্রবেশ করলো কক্ষ মধ্যে।

বনহুর মনিরাকে টেনে নিলো কাছে, বললো—খুশি হয়েছো এবার?

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে মনোভাব প্রকাশ করলো মুখে কোনো জবাব দিলো না। অনাবিল আনন্দ উৎসব ঝরে পড়লো তার অন্তরে।

বনহুর ডাকলো—মনিরা?

বলো?

রাগ করোনা লক্ষ্মীটি।

রাগ আমি করিনা কোনদিন, তবে দুঃখ হয় জীবনে যাকে কামনা করেছিলাম তাকে পেয়েও কেনো পেলাম না। আলেয়ার আলোর মতই মনে হয় তোমাকে।

একটু হেসে বললো বনহুর—তুমি কেন এতো বেশি ভাবো মনিরা? কেন তুমি নিজেকে সর্বক্ষণ আমার চিন্তায় মগ্ন রাখো? আমি তো সুযোগ পেলেই চলে আসি।

এতে আমার মন ভরে না। কোন্ স্ত্রী স্বামীকে সব সময়ের জন্য পাশে পেতে চায় না বলো? আমি কিছু চাই না ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য, গাড়ি, বাড়ি, দালান-কোঠা কিছু না—শুধু চাই তোমাকে ---স্বামীর বুকে মাথা রেখে অফুরন্ত সুখ অনুভব করে মনিরা, তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আনন্দ অশ্রু।

আজ বনহুর নিজেকে কঠিন করে রাখতে পারে না, হারিয়ে ফেলে আপন সত্ত্বা, বলে—মনিরা, কথা দিলাম তুমি যা চাও তাই হবে।

সত্যি? সত্যি বলছো, আর তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না কোথাও?

তোমাকে নিয়ে কান্দাই শহরে স্বাভাবিক নাগরিক বেশে জীবন কাটাবো। মনিরা সব সময় পাবে আমাকে---

এমন সময় মরিয়ম বেগম নিজ হাতে খাবারের ট্রে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন।

পদ-শব্দে মনিরা স্বামীর পাশ থেকে সরে দাঁড়ায়, তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখের পানি মুছে মরিয়ম বেগমের হাত থেকে নাস্তার ট্রেটা নিয়ে স্বামীর সম্মুখে টেবিলে রাখে।

মরিয়ম বেগমকে লক্ষ্য করে বলে বনহুর—মা তুমি কেন এসব করতে গেলে?

পাগল ছেলে আমি করবো না তো কে করবে। মা-ই তো করে সন্তানের জন্য। নে হাত-মুখ ধুয়ে এসে খেয়ে নে বাবা।

নূর ততক্ষণে ফুলমিয়া আর সরকার সাহেবকে নিয়ে উপস্থিত হয় সেখানে।

নূর সরকার সাহেবের হাত ধরে টেনে নিয়ে আসছিলো আর বলছিলো—দাদু দাদু দেখবে এসো আমার আব্বু এসেছেন। আমার আব্বু এসেছেন---

সরকার সাহেব এবং ফুলমিয়া নূরের কথায় অবাক হয়ে গিয়েছিলো। প্রথমে, যখন নূরের সঙ্গে এসে মনিরার কক্ষে প্রবেশ করলো তারা তখন বনহুরকে দেখে শুধু অবাকই হলো না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো।

সরকার সাহেব অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—ছোট সাহেব আপনি এসেছেন? তাইতো নূর ভাই আমাকে বললো দাদু আব্বু এসেছেন।

ফুলমিয়াও আনন্দধ্বনি করে উঠলো—আপনি! সর্দার আপনি---

বনহুর উঠে সরকার সাহেব এবং পরে ফুলমিয়ার সঙ্গে করমর্দন করলো, হাস্যউজ্জ্বল মুখে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলো তাদের।

নাস্তা খেতে খেতে বললো বনহুর—সরকার সাহেব, আমার থাকবার জন্য একটি সুন্দর ছোট-খাটো বাসা খোঁজ করে দিন। এবার আমি সংসারী হবো।

মরিয়ম বেগম হা করে উঠলেন, একি আশ্চর্য কথা বলছিস মনির। এ বাড়ি তাহলে কার?

মা তুমি তো জানো তোমার সন্তানের জীবন স্বাভাবিক নয়। এ বাড়ির দ্বার তার জন্য চিররুদ্ধ---বনহুরের কণ্ঠ শান্ত গম্ভীর শোনালো সকলের কাছে।

এ কথার যেন জবাব খুঁজে পেলো না কেউ।

বনহুর বললো—মা, তুমি কিছু ভেবো না তোমার ছেলে তোমার পাশেই থাকবে।

সরকার সাহেব বললেন—একটা বাসা আমার খোঁজে আছে, অতি সুন্দর বাসা। চৌধুরী বাড়ির নিকটেই হবে।

বনহুর বললো —হাঁ, আপনাদের পছন্দ হলেই আমার পছন্দ। আপনি সব ব্যবস্থা করে ফেলুন, ফিরে এসে যেন বাড়িতে উঠতে পারি।

পুত্রের কথায় মরিয়ম বেগমের আনন্দ আর ধরে না যেন। এমন কথা ইতিপূর্বে কোনোদিন তিনি পুত্রের মুখে শোনেনি। খুশির উচ্ছ্বাসে তিনি খোদার কাছে দু'হাত তুলে দোয়া করলেন—হে খোদা, আমার মনিরের সুমতি দাও।

মায়ের দোয়া শুনে হাসলো বনহুর।

মনিরা স্বামীর মুখে তাকিয়ে রইলো নিষ্পলক নয়নে।

নূর যেন খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে কতদিন পর তার আব্বু ফিরে এসেছেন। সব সময় আব্বুর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে সে।

বনহুর ওকে আদর করে নিজের খাবার তুলে খাওয়াচ্ছে।

এই পরিবেশে কেউ ভাবতেও পারবে না বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর আজ এতো স্বাভাবিকভাবে মা-স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়দের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে।

❑

জাহাজের ডেকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দস্যু বনহুর আর রহমান। বনহুর রেলিং এ হেলান দিয়ে সিগারেট পান করে চলেছে। দৃষ্টি তার সম্মুখে সীমাহীন আকাশে। গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে সে।

রহমান চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, মুখোভাব তার গম্ভীর বিষণ্ন।

বনহুর সিগারেটের ধূম্ররাশির মধ্য দিয়ে তাকালো রহমানের মুখের দিকে, মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে বললো—রহমান?

বলুন সর্দার?

আসবার সময় নূরী এবং নাসরিনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

না সর্দার; জানি না তারা কোথায় কেমন অবস্থায় আছে?

তুমি তাদের জন্য অত্যন্ত ভাবছো বুঝতে পেরেছি। তা দুশ্চিন্তার কথাই বটে। বনহুর হস্তস্থিত অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর নিজের চুলের উপর দক্ষিণ হাতখানা আলগোছে বুলিয়ে নিয়ে বললো—জাহাজে আমাদের ক'জন লোক সর্বমোট রয়েছে হিসাব আছে নিশ্চয়ই?

আছে সর্দার।

দেখো কারো যেন কোনো অসুবিধা না হয়। বিশেষ করে আমার অনুচরগণ আরামেই যেন থাকে।

সেদিকে আমার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে সর্দার।

বেশ। চলো দেখে আসি কে কোন্ কাজে ব্যস্ত আছে।

চলুন সর্দার।

বনহুর আর রহমান 'শাহী' জাহাজের পিছন্ ডেকের দিকে অগ্রসর হলো।

সম্মুখে কয়েকজন পাহারাদার অস্ত্র বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাহাজে যে কোনো বিপদের জন্য এরা সর্বক্ষণ প্রস্তুত; হঠাৎ কোনো জল দস্যু বা কোন জংলীদল আক্রমণ করে বসলে তারা তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাবে।

বনহুর এদের কার্যকলাপের পদ্ধতি লক্ষ্য করে খুশি হলো। এগিয়ে চললো আরও আগে। কতগুলো অনুচর খালাসী ড্রেস পরিহিত অবস্থায় ডেকের রেলিং-এ ছোট ছোট বোট রশি দিয়ে বাঁধছে।

বনহুর আরও এগুলো, দেখলো এখানেও কয়েকজন নানা কাজে ব্যস্ত আছে। এবার বনহুর ইঞ্জিনের দিকে এগুলো।

বনহুর আর রহমান ইঞ্জিন ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে দেখলো, সবাই নিজ নিজ কাজ নিয়ে মেতে রয়েছে।

বনহুর বললো এবার—রহমান, আমাদের রক্ষীদল কোন্ ক্যাবিনে?

সর্দার, জাহাজের খোলের মধ্যে গোপন ক্যাবিনে তারা রয়েছে, চলুন সেখানেও আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

চলো। বনহুর রহমানকে অনুসরণ করলো।

এখন তারা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে। রহমান পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে সর্দারকে।

খোলের মধ্যে এমন সুন্দরভাবে পথ তৈরি করে নিয়েছে রহমান, দেখে খুশি হলো বনহুর। আরও খুশি হলো সে, যখন প্রবেশ করলো এক অদ্ভুত ক্যাবিনে। রহমান সম্মুখস্থ একটি তক্তায় মৃদু চাপ দিতেই তক্তাখানা সরে গেলো, বেরিয়ে এলো একটা দরজা। রহমান বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—ভিতরে প্রবেশ করুন সর্দার।

বনহুর বিস্মিত হলো কারণ সে একটু পূর্বেও বুঝতে পারেনি, জাহাজের নিচে একপাশে এমন একটা ক্যাবিন আছে, যেখানে প্রায় একশত অনুচর গোপনে লুকিয়ে থাকতে পারে।

রহমানের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে পারলো না বনহুর, দেখলো জমকালো ড্রেসে সজ্জিত শতাধিক সশস্ত্র অনুচরকে জাহাজের খোলের মধ্যে গোপন করে রাখা হয়েছে। বনহুর রহমানের পিঠ চাপড়ে দিলো আনন্দে।

একটা ক্যাবিনে গোলা-বারুদ, মেশিন গান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে রাখা হয়েছে। আর একটি ক্যাবিনে রাখা হয়েছে নানারকম ডুবুরী ড্রেস। সাগরতলে অবতরণের যন্ত্রপাতি, দড়ির সিঁড়ি, অক্সিজেন পাইপ, আরও অনেক কিছু।

বনহুর সব কিছু দর্শন করে ফিরে এলো নিজ কামরায়। রহমান সর্দারকে ক্যাবিনের দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে গেলো।

বনহুরের দেহে আজ স্বাভাবিক সাহেবী ড্রেস—প্যান্ট কোট-টাই। বনহুর ক্যাবিনে প্রবেশ করে শরীর থেকে কোটটা খুলে আলনায় রাখে, তারপর টাই খুলে রেখে একটা সোফায় বসে পড়ে। টেবিল থেকে একটা ইংরেজি সংবাদপত্র হাতে তুলে নিয়ে মেলে ধরে চোখের সামনে।

অল্পক্ষণ সংবাদপত্রটায় নজর বুলিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে বনহুর এগিয়ে যায় শয্যার দিকে। হঠাৎ অবাক হয় সে, একটু পূর্বে এলোমেলো রেখে গিয়েছিলো, সে বিছানাটা কে এমন করে গুছিয়ে রেখে গেছে।

শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে চিবুকে হাত রেখে একটু ভাবলো তারপর মৃদু এক টুকরা হাসির রেখা ফুটে উঠলো তাঁর ঠোঁটের কোণে।

পা থেকে জুতোজোড়া না খুলেই শয্যায় গা এলিয়ে দিলো বনহুর।

গোটাদিনের ক্লান্তি আর অবসাদের পর অল্পক্ষণেই বনহুরের চোখের পাতা দুটো মুদে আসে আপনা আপনি। জুতাসহ তার পা'দুখানা ঝুলছে খাটের পাশে।

হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে যায় বনহুরের, কে যেন তার পা থেকে বুট জোড়া খুলে রাখছে। নিদ্রা ছুটে গেলেও বনহুর নিদ্রার ভান করে রইলো, দেখলো সকাল বেলা যে অনুচরটি তার ক্যাবিনে খাবার রেখে গিয়েছিলো এ সেই অনুচর। বনহুর অবাক হলো কিন্তু সে কিছু না বলে চুপচাপ দেখতে লাগলো সে কি করে।

অনুচরটি বনহুরের পা থেকে জুতোজোড়া খুলে পা দুটি শয্যায় তুলে রাখলো অতি সন্তর্পণে; কলম্বলটা যত্নসহকারে চাপা দিলো তার দেহে। তারপর লঘু পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে।

অনুচরটি ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে যেতেই বনহুর স্মিত হেসে উঠে বসলো শয্যায়, অতি সর্তকতার সঙ্গে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে আসতেই রহমান এসে দাঁড়ায় তার সম্মুখে—সর্দার, ফারহান বলছে পথ ভুল হয়েছে।

বনহুর অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো, ভুলে গেলো একটু পূর্বে সেই অনুচরটির কথা যে তার পা থেকে জুতা খুলে সযত্নে দেহে কম্বল চাপা দিয়েছিলো। বললো বনহুর—কোথায় সে?

সর্দার, বৈজ্ঞানিক ফারহান তার ক্যাবিনে।

চলো দেখি।

বনহুর আর রহমান বৈজ্ঞানিক ফারহানের ক্যাবিনের দিকে এগিয়ে চললো।

ফারহান টেবিলে ম্যাপখানা মেলে নিয়ে উবু হয়ে মনোযোগ সহকারে দেখছিলো, ক্যাবিনে প্রবেশ করলো বনহুর আর রহমান। ফারহানের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো তারা।

ফারহান পেন্সিল দ্বারা ম্যাপের একস্থানে দেখিয়ে বললো—আমাদের এই পথে যেতে হতো কিন্তু আমরা ভুলক্রমে অন্যদিকে চলে এসেছি সর্দার।

বনহুরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, বললো সে—এতো বড় ভুল হলো আপনি তা লক্ষ্য করেননি কেন মিঃ ফারহান?

পথটা তো স্থলপথ নয়—জলপথ; কাজেই এ রকম ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

তাতো বুঝলাম কিন্তু আমরা যে পথে এখন অগ্রসর হচ্ছি সেপথ অতি বিপদজনক একথা আপনি জানেন নিশ্চয়ই।

জানি সর্দার। আর জানি বলেই আমি বেশি বিচলিত হয়েছি।

এখন জাহাজ ঠিক পথে নেবার ব্যবস্থা করুন।

হাঁ, আমি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সেভাবে পথ-নির্ণয় নিয়ে পরামর্শ করবো। বললো ফারহান।

বনহুর নিজে এবার ঝুঁকে পড়লো ম্যাপখানার উপর। বেশ কিছুক্ষণ ম্যাপ দেখার পর বললো—মিঃ ফারহান, আপনি ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলুন, আমাদের জাহাজখানাকে নারুন্দী দ্বীপের পাশ দিয়ে সুয়াব-সাগর হয়ে তুহানের দিকে নিতে। এখন আমরা যে স্থানে এসে পড়েছি সে স্থান হতে ফিরবার এই একমাত্র পথ। কি করে যে এমন মারাত্মক ভুল হয় আমি বুঝতে পারি না। বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—যাও রহমান, ক্যাপ্টেনকে আমার ক্যাবিনে আসতে বলো। আপনিও ম্যাপখানা নিয়ে আমার ওখানে আসুন মিঃ ফারহান।

আচ্ছা সর্দার। বললো ফারহান।

বনহুর আর কোনো কথা না বলে গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেলো ফারহানের কামরা থেকে।

একটু পরে বোরহান, রহমান ও বৈজ্ঞানিক ফারহান উপস্থিত হলো বনহুরের ক্যাবিনে।

এক সঙ্গে সর্দারকে কুর্ণিশ জানালো ওরা তিনজন।

বনহুর ক্যাপ্টেন বোরহানকে লক্ষ্য করে বললো—ক্যাপ্টেন, জাহাজ এখন কোন্ পথ ধরে এগুচ্ছে?

সর্দার, আমরা ভুলপথে এসেছি।

এমন ভুল কি করে হলো? বৈজ্ঞানিক ফারহান, রহমান এরাতো সব সময় পথের নির্দেশ জানিয়ে দিচ্ছে।

হাঁ সর্দার।

তবু এমন হলো কেন? জানো, যে কোন মুহূর্তে আমাদের জাহাজ ডুবন্ত পর্বতের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যেতে পারে? কারণ, এসব সমুদ্রে যে কোনো স্থানে চোরা পর্বত গোপনে লুকিয়ে আছে। একটু নিশ্চুপ থেকে পুনরায় বললো বনহুর—আমি যেভাবে পথের নির্দেশ বলে দিচ্ছি সেভাবে নাবিককে জাহাজ চালনা করতে বলে দাও। ফারহানের হাত থেকে ম্যাপখানা নিয়ে মেলে ধরলো টেবিলে।

রহমান, ক্যাপ্টেন বোরহান, বৈজ্ঞানিক ফারহান ওরাও এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে।

বনহুর টেবিলে ম্যাপখানা মেলে ধরে তীক্ষ্ণ নজরে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো, তারপর এক জায়গায় আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললো—বোরহান তুমি এ পথে জাহাজখানাকে ফিরিয়ে নাও। নারুন্দী দ্বীপের পাশ দিয়ে সুয়াব সাগর হয়ে তুহানের দিকে যেতে হবে।

আচ্ছা সর্দার, আপনার আদেশ অনুযায়ী জাহাজখানাকে সঠিক পথে চালনা করার ব্যবস্থা করছি।

বনহুর এবার বৈজ্ঞানিক ফারহানকে লক্ষ্য করে বললো —মিঃ ফারহান, আপনি ক্যাপ্টেন বোরহানকে সাবধানে জাহাজ চালনা করায় সাহায্য করবেন। নানারকম বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, আমি চাই না কাহাতুর পৌঁছানোর পূর্বে আমাদের জাহাজ কোথাও আটকা পড়ে।

আচ্ছা সর্দার, ফারহান কথাটা উচ্চারণ করে বেরিয়ে গেলো। তাকে অনুসরণ করলো বোরহান।

রহমানও প্রস্থান করতে উদ্যত হলো।

বনহুর বললো—রহমান শোন।

রহমান দাঁড়িয়ে পড়লো।

বনহুর বললো—রহমান, আমাদের জাহাজ এখন এমন এক পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, যে পথে আত্মগোপন করে আছে অসংখ্য চোরা পর্বত। একটি পর্বতের গায়ে আমাদের জাহাজ ধাক্কা খেলে আর কোনো উপায় থাকবে না, জাহাজখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটু থেমে বললো আবার সে—এখন যে পথে আমাদের জাহাজ ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে সে পথেও বিপদ কম নেই। নারুন্দী দ্বীপের পাশ দিয়ে আমাদের জাহাজ যখন সুয়াব সাগর অভিমুখে রওয়ানা দেবে তখন ঐ দ্বীপের অধিবাসিগণ আমাদের উপর হামলা চালাতে পারে।

হাঁ সর্দার, নারুন্দী দ্বীপ জংলীদের রাজ্য। এ দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় যদি তারা কোনোরকম আভাস পায় তাহলে আমাদের রক্ষা থাকবে

কিন্তু এতোবড় একটা জাহাজ নারুন্দীর পাশ দিয়ে চলে যাবে আর জংলীগণ এতটুকু আভাস পাবে না? রহমান, জংলীদের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থেকো।

সর্দার, আপনার আদেশ আমি সবাইকে জানিয়ে দেবো।

যাও। এককাপ চা পাঠাতে বলো।

রহমান বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে একজন অনুচর ট্রের উপরে চায়ের কাপ নিয়ে হাজির হলো।

বনহুর তখন একখানা পত্রিকা চোখের সম্মুখে তুলে ধরে পড়ছিলো। অনুচরটিকে লক্ষ্য করে বললো—রাখো।

অনুচরটি যখন চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখছিলো তখন বনহুর কাগজের পাশ দিয়ে তাকিয়ে দেখে নিলো, একটা মৃদু হাসির আভাস দেখা দিলো তার মুখে।

অনুচরটি চায়ের কাপ রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, বনহুর বললো—শোন।

থমকে দাঁড়ালো অনুচরটি।

বনহুর বললো—তোমার সঙ্গী কোথায়?

অনুচরটি কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর কাগজখানা টেবিলের একপাশে রেখে সোজা হয়ে বসলো, তখনও তার মুখে হাসির আভাস ফুটে রয়েছে। চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিলো বনহুর।

গভীর রাতে বনহুর ক্যাবিনে থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে। অন্ধকারে এগিয়ে চললো সে, কে কেমনভাবে ডিউটি করছে স্বচক্ষে দেখার জন্যই বনহুর বেরিয়েছে।

বনহুর ডেক ঘুরে এসে বাবুর্চিখানার পাশে থমকে দাঁড়ালো। দেখলো, দুটো ছায়ামূর্তি তাকে দেখামাত্র অতি সন্তর্পণে ক্যাবিন মধ্যে লুকিয়ে পড়লো।

বনহুর সিগারেট ধরালো তারপর নিজের পথে পা বাড়ালো। ক্যাবিনে প্রবেশ না করে পিছন ডেকে এসে দাঁড়ালো, সীমাহীন অন্ধকারে তাকিয়ে রইলো, সিগারেটের ধূম্র কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিলো তখন।

ফিরে এলো বনহুর নিজের ক্যাবিনে। হঠাৎ তার নজর চলে গেলো ওদিকে জানালার শার্শীর দিকে। কে যেন বেরিয়ে গেলো তার ক্যাবিন থেকে। শার্শীর ওপাশে দেখা গেলো, দুটো মানুষ চলে গেলো দ্রুত গতিতে।

কে এরা, কি এদের উদ্দেশ্য? বনহুর শয্যায় শয়ন করে ভাবতে লাগলো। কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করার পর হঠাৎ পাশের টেবিলে ১নং সুইচে চাপ দিলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে রহমানের কক্ষে সংকেতসূচক লাল আলো জ্বলে উঠলো। রহমান বুঝতে পারলো তার সর্দার তাকে আহ্বান জানিয়েছে।

বনহুরের টেবিলে নম্বরযুক্ত কয়েকটা সুইচ ছিলো, এগুলো সংকেতসূচক সুইচ, কোনো বিপদ উপস্থিত হলে কিংবা অনুচরদের একত্রিত করার প্রয়োজন পড়লে তখন এসব সুইচ বনহুর ব্যবহার করতো।

সংকেত আলো জ্বলে উঠতেই রহমান সর্দারের ক্যাবিনের দিকে রওয়ানা দিলো।

বনহুর তখন শয্যায় হেলান দিয়ে সিগারেট পান করছিলো। রহমান ক্যাবিনে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর বললো—রহমান, বাবুর্চিখানায় ক'জন লোক কাজ করছে?

সর্দার, পাঁচজন আছে।

এক্ষুণি ওদের আমার সম্মুখে হাজির করো।

আচ্ছা সর্দার। রহমান মুখে বললো 'আচ্ছা সর্দার' কিন্তু মনে মনে শিউরে উঠলো, না জানি বাবুর্চি বেচারীদের কি অপরাধ হয়েছে।

রহমান বেরিয়ে গেলো, বাবুর্চিখানায় প্রবেশ করে দেখলো বাবুর্চিরা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু একি! তিনজন কেন, আর দু'জন গেলো কোথায়? একটু ঘাবড়ে গেলো, হঠাৎ ওদিকে তাকাতেই দেখলো, এক কোণে দু'জন জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে।

রহমান ওদের পাশে গিয়ে ডাকলো—এই, তোমরা উঠো।

ওরা দু'জন ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো।

রহমান পাঁচজন বাবুর্চিসহ সর্দারের ক্যাবিনে এসে হাজির হলো।

বনহুর যেমন ভাবে শয্যায় বসে ছিলো তেমনি বসে আছে।

রহমান বাবুর্চিদের নিয়ে হাজির হলো, বললো বনহুর—রহমান এদের বন্দী করে রাখো।

সর্দারের কথায় চমকে উঠলো রহমান, বিনা অপরাধে বাবুর্চিদের বন্দী করার আদেশ কেন দিলেন সর্দার, ভেবে পেলো না। বাধ্য হলো সে সর্দারের আদেশ পালনে।

রহমান বাবুর্চিদের বন্দী করে রেখে ফিরে এলো বনহুরের ক্যাবিনে বললো—সর্দার, কাল থেকে আমাদের পাক বন্ধ হয়ে যাবে যে?

অন্য অনুচর যারা পাক জানে তাদের বাবুর্চিখানায় নিয়োজিত করো।

বনহুরের কথা মতোই কাজ করলো রহমান।

পরদিন থেকে পাকের জন্য কয়েকজন অনুচর নিয়োজিত হলো।

বনহুর কেন যে বাবুর্চিদের এভাবে বন্দী করে রাখলো কেউ বুঝতে পারলো না, রহমান পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছে। বিনা অপরাধে এদের প্রতি সর্দারের এমন আচরণ সত্যি বিস্ময়কর।

দু'দিন পর তাদের জাহাজ নারুন্দী দ্বীপের নিকটে পৌঁছে গেলো। জাহাজখানা যতই দ্বীপের নিকটবর্তী হচ্ছে ততই 'শাহী'র লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগলো। ভালয় ভালয় নারুন্দী দ্বীপ অতিক্রম করতে পারলে তাদের স্বস্তি আসবে। যদিও শাহী'তে সবরকম অস্ত্রশস্ত্র এবং দক্ষ অনুচরগণ রয়েছে তবু বনহুর নিজেও মনে মনে আশঙ্কিত হলো কিছুটা।

অনুচরদের সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দিলো বনহুর।

বনহুর নিজেও ড্রেস পরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ক্যাপ্টেন বোরহানের ক্যাবিনে এসে বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দাঁড়ালো। দূরে—বহু দূরে—নারুন্দী দ্বীপ নজরে পড়ছে। কালো একটি রেখার মত মনে হচ্ছে যেন।

বনহুরের পাশে ক্যাপ্টেন বোরহান ও বৈজ্ঞানিক ফারহান দাঁড়িয়ে আছে। তারাও বাইনোকুলার নিয়ে দূরে দেখছে।

সম্মুখে ওয়্যারলেস মেশিন, বাইনোকুলারে দৃষ্টি রেখে ইঞ্জিন চালককে পথের নির্দেশ দিচ্ছে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

জাহাজখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই নারুন্দী দ্বীপের অতি নিকটে পৌঁছে গেলো। এবার বনহুর জাহাজের স্পীড কমিয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দিলো। [illegible] জাহাজের শব্দ যেন বেশি দূর না গিয়ে পৌঁছে।

কিন্তু এতো সাবধানতা সত্ত্বেও বিপদ হানা দিলো।

জাহাজের শব্দে নারুন্দী দ্বীপের জংলীগণ সজাগ হয়ে উঠলো।

জাহাজখানা তখন ঠিক দ্বীপের পাশ কেটে চলছিলো।

বনহুর দেখলো, অগণিত জংলী বল্লম আর বর্শা নিয়ে ছুটে আসছে। অনেকের হাতে রয়েছে তীর-ধনু। এক-একজনের চেহারা যেন পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত জমকালো। সূর্যের আলোতে ঝকমক করছে তাদের হাতের অস্ত্রগুলো।

বনহুরের নির্ভীক অনুচরগণও শিউরে উঠলো। ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো তাদের মুখমণ্ডল। তবু কেউ নিজ স্থান হতে সরে যেতে সাহসী হলো না। সর্দারের আদেশ পালনে তারা দৃঢ়সঙ্কল্প।

বনহুর এবার জাহাজের স্পীড বাড়িয়ে দেবার জন্য আদেশ দিলো। এতো সাবধানে চলার পরও যখন নারুন্দী দ্বীপবাসী জংলীদের দৃষ্টি থেকে রেহাই পেলো না তখন আর কোনো উপায় নেই। যতদ্রুত জাহাজখানাকে দ্বীপের সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে নেয়া যায় ততই মঙ্গল।

বনহুর ক্ষিপ্রতার সাথে ইঞ্জিন চালকগণকে জাহাজ চালনার নির্দেশ দিয়ে চললো।

পাশে দাঁড়িয়ে ফারহান ম্যাপ দেখছে এবং বনহুরকে পথ বলে দিচ্ছে।

ক্যাপ্টেন বোরহানও ব্যস্ত রয়েছে তার কাজে।

জংলীগণ এবার জাহাজখানাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে।

বনহুর আশঙ্কিত হয়ে পড়লো, তীরগুলো তার জাহাজের গায়ে এসে বিদ্ধ হচ্ছে। কোনো কোনোটা এসে ডেকের উপর পড়ছে।

রহমান সম্মুখ ডেকে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলো, সে ওয়্যারলেসে জানালো-সর্দার, জংলীদের নিক্ষিপ্ত তীর এসে জাহাজের গায়ে বিদ্ধ হচ্ছে। জাহাজের ডেকেও এসে পড়ছে। তীরগুলো বিষাক্ত বলেই মনে হচ্ছে।

বনহুর বললো—আমার অনুচরদের সাবধানে আত্মগোপন করে নিজ নিজ কাজ করে যেতে বলো।

সর্দার, জাহাজখানা এখন দ্বীপের এতো নিকটে এসে পড়েছে যে, ওরা বর্শা নিক্ষেপ করলেও আমাদের জাহাজের গায়ে বিদ্ধ হবে। রহমান ব্যস্তকণ্ঠে বললো।

বনহুর ইঞ্জিন চালককে জানালো—ইয়াকুব, জাহাজ দ্বীপ থেকে সরিয়ে নাও।

ইয়াকুব বিজ্ঞ নাবিক, বললো সে—সর্দার, আমি যতদূর সম্ভব দ্বীপ থেকে জাহাজ 'শাহী' কে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছি। কিন্তু কোনো উপায় নেই। দক্ষিণে দ্বীপ, উত্তরে ডুবন্ত পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। একচুল কমবেশি হলে আমাদের জাহাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

ওয়্যারলেসে রহমানের গলা শোনা গেলো—সর্দার, ডেকের একজন অনুচরের বুকে তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে। পরক্ষণেই শোনা গেলো আবার রহমানের কণ্ঠ—সর্দার, আর একজন মৃত্যুবরণ করেছে।

বনহুর দেখলো, অসংখ্য তীর বৃষ্টির মতোই এসে পড়ছে তার জাহাজের উপরে, কতগুলো বিদ্ধ হচ্ছে জাহাজের গায়ে।

বনহুর তার সশস্ত্র অনুচরগণকে তৈরি হবার জন্য নির্দেশ দিলো এবং মেশিন গান চালাতে বললো।

সর্দারের আদেশ পাওয়ামাত্র যারা মেশিন গানে ছিলো তারা জংলীদের লক্ষ্য করে মেশিন গান চালালো।

বনহুর এবং অন্যান্য যারা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে জংলীদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো তারা দেখলো, মেশিন গানের গুলিতে গুলীবিদ্ধ হয়ে কতগুলো জংলী রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লো ভূতলে। সঙ্গে সঙ্গে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো যেন জংলীগণ। তারা কতগুলো ছিপ নৌকা নিয়ে দ্বীপ থেকে জলে নেমে পড়েছে। দ্রুতগতিতে ছিপ নৌকা চালিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা জাহাজখানার দিকে।

রহমান বললো—সর্দার, এতো দুঃসাহসী ওরা, মরেও ভয় পায় না। একসঙ্গে অগণিত ছিপ নৌকা নিয়ে তেড়ে আসছে। এদিকে আমাদের জাহাজে অসংখ্য তীর এসে পড়ছে, কেউ বাইরে ডেকে এসে দাঁড়াতে পারছে না। কাজেই জংলীদের পাল্টা জবাব দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বনহুর জানালো—যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করে পাল্টা জবাব দিতে হবে, না হলে বিপদ। তুমি আমার অনুচরদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বলো। রহমান, যেমন করে হোক জংলীদের কবল থেকে 'শাহী' এবং নিজেদের রক্ষা করতেই হবে। আমিও আসছি নিচে।

রহমান চঞ্চলকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলো—সর্দার, আমরা যতক্ষণ জীবিত আছি ততক্ষণ আপনাকে আমরা নিচে আসতে দেবো না। আমরা জংলীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবো।

তা হয় না রহমান, যেভাবে জংলীগণ আমাদের জাহাজখানাকে আক্রমণ করে বসেছে তাতে মনে হয় সহজে আমরা এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবো না। বনহুর রহমানের সঙ্গে কথা বলেই ওয়্যারলেস মেশিন ইঞ্জিন কক্ষে যোগ করে নিয়ে বললো—ইয়াকুব, জাহাজের স্পীড আরও বাড়িয়ে যাও। জংলীদের ছিপ নৌকা জাহাজের নিকটে পৌছাবার পূর্বেই আমাদের জাহাজ যেন দূরে সরে যেতে সক্ষম হয়। আমি নিজে গিয়ে ওদের ছিপ নৌকাগুলো ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা নিচ্ছি।

ওয়্যারলেসে ইয়াকুবের গলা শোনা যায়—আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি সর্দার।

হাঁ, তাই করো। বললো বনহুর।

রহমানের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর—সর্দার, আমাদের অনুচর প্রায় বিশজনের মত নিহত হয়েছে।

বনহুর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, বলে সে—আমি এজন্য দুঃখিত রহমান। এতোবড় ভুল হবে জানতাম না। বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে নিচে নেমে এলো, তাকিয়ে দেখলো— জংলীগণ অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ছিপ নৌকা নিয়ে তীরবেগে জাহাজের দিকে ছুটে আসছে। অসভ্য জংলীদের বুদ্ধি কম নয়—বুঝতে পারলো বনহুর, কারণ জংলীগণ জাহাজের সম্মুখভাগ থেকে আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত এগুচ্ছে।

বনহুর ড্রেসিং ক্যাবিনে প্রবেশ করে ইস্পাতের বর্ম পরে নিলো। মাথায় ইস্পাতের মজবুত ক্যাপ, হাতে গণ্ডারের চামড়ার কভার, পায়ে ভারী বুট। মেশিনগান নিয়ে সে সম্মুখ ডেকে এসে দাঁড়ালো, মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুলী চালিয়ে চললো।

বনহুরের মেশিনগানের সম্মুখে জংলীদের ছিপ নৌকাগুলো তৃণকুটার মত ছিটকে পড়তে লাগলো। এক-একটা জংলী তীব্র আর্তনাদ করে গড়িয়ে পড়লো সাগরবক্ষে।

বনহুরের মেশিনগান থামতে চায় না যেন।

জংলীগণ ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেলো। যে কয়টা ছিপ নৌকা দূরে ছিলো সেগুলো তীর অভিমুখে দ্রুত ফিরে চললো।

অন্যান্য জংলী যারা দ্বীপের উপর থেকে জাহাজটিকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ছিলো তারাও ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করলো।

আধঘন্টার মধ্যে সাগরবক্ষ এবং দ্বীপের তীরভাগ জনশূন্য হয়ে পড়লো। অসংখ্য জংলী সব যেন হাওয়ায় উবে গেলো ধূমকেতুর মত। শুধু তীরে বালুর মধ্যে পড়ে রইলো কতগুলো জমকালো রক্তাক্ত দেহ।

সাগরবক্ষে জংলীদের ছিপ নৌকার চিহ্নটি রইলো না। উচ্ছল স্রোতের টানে ভেসে গেলো ওদের উল্টে পরা ভাঙাচুরো নৌকার তক্তাগুলো। আর নিহত জংলীগণ কোথায় তলিয়ে গেলো তার সন্ধান রইলো না।

জাহাজখানা ততক্ষণে নারুন্দী দ্বীপ ছেড়ে সরে এসেছে কয়েক মাইল।

রহমান এবং অন্যান্য অনুচর সবাই এসে সর্দারের পাশে দাঁড়িয়েছে। সকলেরই চোখেমুখে রাজ্যের বিস্ময়! যদিও সর্দারের বীরত্ব সম্বন্ধে তারা অজ্ঞাত নয়, তবু আজ তারা হতবাক স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। একা সর্দার কি করে এতোগুলো ভয়ঙ্কর জংলীকে হার মানিয়ে ছাড়লো।

সর্দারকে ধন্যবাদ জানানোর সাহস তাদের নেই, কাজেই সবাই থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর দ্রুতহস্তে শরীর থেকে বর্মড্রেস খুলে ফেললো। তারপর চলে গেলো ইঞ্জিনকক্ষে। যাবার সময় রহমানকে বললো—রহমান, আমি ইঞ্জিনে যাচ্ছি, ইয়াকুব হয়তো পেরে উঠবে না। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের জাহাজখানাকে নারুন্দী দ্বীপের পাশ থেকে সরিয়ে নিতে হবে। ওরা জংলী সর্দারকে নিয়ে আবার দলবলসহ আমাদের জাহাজে আক্রমণ চালাতে পারে। তুমি, ক্যাপ্টেন বোরহান এবং ফারহানসহ এদিকে লক্ষ্য রাখবে, আর যারা আহত হয়েছে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।

বনহুর ইঞ্জিন ক্যাবিনে প্রবেশ করে নিজে ইঞ্জিন চালনা করে চললো। ঘেমে নেয়ে উঠেছে তার জামা-কাপড়। একটু পূর্বে ইস্পাতের বর্ম পরে তাকে মেশিনগান চালাতে হয়েছে। তারপর ইঞ্জিনে বয়লারের তীব্র উষ্ণতায় রক্তাভ হয়ে উঠেছে বনহুরের সুন্দর মুখমণ্ডল। বারবার হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে ফেলছিলো।

প্রায় ঘন্টা দুই পর জাহাজখানা নারুন্দী দ্বীপ ছেড়ে মাইল কয়েক দূরে সরে এলো। ক্যাপ্টেন বোরহান জানালো, এবার তারা জংলীদের আয়ত্তের বাইরে এসে গেছে। জাহাজ থেকে বিপদ সংকেতধ্বনি ঘন্টা বন্ধ করে দেয়া হলো।

বনহুর বেরিয়ে এলো ইঞ্জিন থেকে।

রহমান, বৈজ্ঞানিক ফারহান, ক্যাপ্টেন বোরহান এরা তাদের সর্দারকে অভিনন্দন জানালো। আজ সবাই তাদের সর্দারের বিস্ময়কর বীরত্বে গৌরবান্বিত।

বনহুর নিজ ক্যাবিনে এসে সোফায় গা এলিয়ে দিলো।

রহমান সর্দারের ঘর্মাক্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিলো।

কিছুক্ষণ দেহটাকে সোফায় এলিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরালো বনহুর।

রহমান দাঁড়িয়েছিলো তার পাশে।

বনহুর একমুখ ধূয়া সম্মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বললো—রহমান, আমরা এখন উপস্থিত বিপদ থেকে মুক্ত।

হাঁ, সর্দার।

বনহুর সোজা হয়ে বসলো, বললো—যে অনুচর পাঁচজনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে তাদের মুক্তি দাও।

রহমান অবাক হয়ে তাকালো সর্দারের মুখের দিকে, তারপর বললো—বাবুর্চি অনুচরদের মুক্তি দিতে বলেছেন সর্দার?

হাঁ। যাও ওদের বন্দী ক্যাবিন থেকে বের করে দাও গে।

রহমান খুশি হয়ে চলে গেলো বটে কিন্তু সে ভেবে পেলো না কেনই বা সর্দার এদের বন্দী করার আদেশ দিয়েছিলো আর কেনই বা এখন এদের মুক্তি দেবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।

❑

রহমান বন্দী ক্যাবিনে প্রবেশ করে বাবুর্চিদের লক্ষ্য করে বললো—সর্দারের হুকুমে তোমাদের মুক্তি দেয়া হলো।

বন্দী বাবুর্চিদের মধ্যে তিনজনকে অত্যন্ত খুশি হতে দেখা গেলো। অপর দু'জন গোমটা মেরে বসে রইলো, মনোভাব তারা মুক্তি চায় না।

রহমান বললো—এই, তোমরা বের হচ্ছো না কেন?

কোনো উত্তর নেই।

রহমান পর পর কয়েকবার বললো, তবু কোনো জবাব পেলো না। বাবুর্চিদ্বয় বের হবে না, এমনি ভাব দেখালো।

রহমান অগত্যা ফিরে এলো বনহুরের ক্যাবিনে।

বনহুরকে এখন রহমান অনেকটা সচ্ছ দেখতে পেলো। তার সুন্দর মুখমণ্ডল দীপ্ত উজ্জ্বল লাগছে। ক্যাবিন মধ্যে পায়চারী করছিলো পিছনে হাত দু'খানা রেখে। রহমান ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই বনহুর ফিরে তাকালো, বললো—ওদের মুক্তি দিয়েছো?

রহমান বললো—হাঁ সর্দার। কিন্তু দু'জন একগুয়ে মত। বন্দী ক্যাবিনে বসে রয়েছে, তারা কিছুতেই বের হচ্ছে না, কোনো কথাও বলছে না।

হঠাৎ বনহুর হেসে উঠলো সশব্দে, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—দু'জন বের হচ্ছে না, তাদের তুমি বের করতে পারলে না রহমান?

না সর্দার; একেবারে যেন লোহার মত শক্ত হয়ে বসে আছে।

এবার যাও, যদি না বের হতে চায় তাহলে ওদের মাথার পাগড়ী খুলে আমার নিকটে নিয়ে এসো।

সর্দারের অদ্ভুত কথায় আশ্চর্য হলো রহমান, ওদের পাগড়ী খুলে নিয়ে আসার জন্য কেন আদেশ দিলো। রহমান বেরিয়ে গেলো।

বন্দী ক্যাবিনে প্রবেশ করে রহমান দেখলো, ওরা তখনও বসে আছে গুমটো মেরে।

রহমান বললো—এই, তোমরা বের হবে কি না বলো?

তবু কথা নেই।

রহমান এবার ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে গেলো ওদের পাশে। চলো, সর্দারের কাছে চলো। জোর করে দু'জনকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো, তারপর ওদের মাথার পাগড়ী খুলে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে রহমান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লো। তাকিয়ে দেখলো, নূরী আর নাসরিন তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে বললো—তোমরা!

নাসরিন হেসে উঠলো—কেমন জব্দ বলো তো এবার? তোমরা বলেছিলে আমাদের দু'জনকে সঙ্গে নেবে না!

নাসরিন আর নূরীকে দেখে অনেক খুশি হয়েছে রহমান। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে খুশিতে। নূরী না থাকলে এ মুহূর্তে নাসরিনকে জড়িয়ে ধরে সে আনন্দ প্রকাশ করতো।

রহমান হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, এতোক্ষণে সে বুঝতে পারলো, কেন সর্দার বাবুর্চিখানার সবাইকে বন্দী করে রেখেছিলো। নাক্রুন্দী দ্বীপের নিকটে পৌঁছলে বিপদ ঘটতে পারে; হয়তো বা জংলীদের আক্রমণে ওরা প্রাণ হারিয়ে বসতো, এ কারণেই সর্দার কৌশলে এদের আটক করেছিলো।

রহমান মনের আনন্দ মনে চেপে বেরিয়ে গেলো এবার। বনহুর বসে ছিলো, রহমানকে হাস্যোজ্জ্বল মুখে প্রবেশ করতে দেখে সেও হাসিমুখে বললো—রহমান, জানতাম জংলীদের সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। আর সে কারণেই নূরী আর নাসরিনকে আমি ইচ্ছাপূর্বক আটক রেখেছিলাম।

রহমান লজ্জিত দৃষ্টি তুলে ধরলো সর্দারের মুখে, কোনো জবাব দিতে পারলো না।

যাও, ওদের জন্য সুব্যবস্থা করো।

রহমান নতমস্তকে বেরিয়ে গেলো বনহুরের ক্যাবিন থেকে।

নূরী আর নাসরিনের থাকার জন্য সুবন্দোবস্ত করে দিলো রহমান। তার মনে প্রচুর আনন্দ হলো, কারণ নূরী আর নাসরিনের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ছিলো সে।

নিহত অনুচরদের মৃতদেহগুলো যত্নসহকারে সাগরবক্ষে ভাসিয়ে দেয়া হলো। আর আহতদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা চললো।

বনহুর ইচ্ছা করেই নূরীর সঙ্গে দেখা করলো না।

রহমান কিন্তু নাসরিনকে কাছে পাবার জন্য উতলা হয়ে উঠলো। সুযোগ খুঁজতে লাগলো সেই মুহূর্তের।

এক সময় সুযোগ এলো রহমানের, নাসরিন কি যেন কাজে পাশের ডেকে এসেছে।

পিছন থেকে রহমান ওকে ধরে ফেললো।

চমকে উঠলো নাসরিন, ফিরে তাকাতেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চোখ দুটো।

রহমান নাসরিনকে গভীর আবেগে আকর্ষণ করলো, বললো—নাসরিন, কেন তোমরা আমাকে এতো দুঃখ, এতো ব্যথা দিলে? কেনো আত্মগোপন করেছিলে বলতো?

হাসলো নাসরিন—তোমরা আমাদের রেখে চলে যাবে আর আমরা তোমাদের জন্য ভেবে ভেবে চোখের পানি ফেলবো? তাই আত্মগোপন করা ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না।

সর্দারের কাছে আমি ভীষণ লজ্জিত হয়েছি নাসরিন।

কেন?

আমি নিজে তোমাদের বন্দী করেছি, অথচ আমি চিনতে পারিনি। আজ তোমাদের পাগড়ী খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন শুধু এ কারণেই, আমি যেন তোমাদের চিনতে পারি।

এমন সময় পিছনে শোনা যায় নূরীর গলা—খুব জব্দ হয়েছো রহমান, তাই না?

নূরীর আগমনে রহমান বাহুমুক্ত করে দিলো নাসরিনকে। তারপর বললো—জব্দ বলে জব্দ, একেবারে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছো তোমরা আমাকে।

বললো নূরী—যা হোক, মাফ করে দাও তুমি আমাদের দু'জনকে।

রহমান হেসে বললো—সর্দারের কাছে বিচার না হওয়া অবধি মাফ নেই।

কি বললে রহমান? সর্দার বিচার করবে আমাদের?

হাঁ, লুকিয়ে জাহাজে আসার অপরাধে তোমরা অপরাধী, সাজা তোমাদের পেতেই হবে। চলো, তোমরা সর্দারের কাছে চলো।

রহমান নাসরিন আর নূরীকে নিয়ে হাজির করলো সর্দারের ক্যাবিনে।

বনহুর তখন ড্রেস পরছিলো।

রহমান ক্যাবিনে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানিয়ে বলে—সর্দার, এরা আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে জাহাজে আত্মগোপন করে। কাজেই এদের শাস্তি হওয়া দরকার।

রহমানের কথায় বনহুরের মুখে হাসির আভাস ফুটে উঠে, কিন্তু মুখোভাব গম্ভীর করে বলে—হাঁ, সাজা হওয়া দরকার।

নূরী বিস্ময়ভরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তুলে তাকালো বনহুরের দিকে। সে ভেবেছিলো, বনহুর তাকে দেখামাত্র আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠবে, কিন্তু সে তাকে দেখেও কোনো আনন্দ প্রকাশ করলো না। বরং শাস্তি দেবার জন্য নির্দেশ দিলো। রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করলো নূরী।

বনহুর বললো—নিয়ে যাও এদের।

রহমান বললো—সর্দার, এদের জন্য কি সাজা হবে?

এদের একটা ক্যাবিনে আটকে রাখবে যেন বের হতে না পারে।

আচ্ছা সর্দার।

নূরী বলে উঠলো এবার—না, রহমানের সাধ্য নেই সে আমাদের আটকে রাখে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো বনহুর নূরীর দিকে।

নাসরিন বললো—সর্দার, আমরা ক্যাবিনে বন্দী হয়ে থাকতে পারবো না। তার চেয়ে অন্য কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

রহমান এবং বনহুর ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, নূরী চট্ করে সম্মুখস্থ টেবিল থেকে রিভলভারখানা তুলে নিয়ে উদ্যত করে ধরে—খবরদার, নড়বে না কেউ।

বনহুর আর রহমান হতভম্ভ হয়ে পড়লো।

নাসরিনও কম অবাক হয়নি।

নূরী গম্ভীর কণ্ঠে বললো—একচুল এগুলে আমি গুলী ছুঁড়বো। নাসরিন, এদের দু'জনকে এই ক্যাবিনে বন্দী করে চলো আমরা বেরিয়ে যাই।

নূরী, নাসরিনের হাত ধরে পিছু হটতে লাগলো।

বনহুর আর রহমান অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাবিনের মেঝেতে।

নূরীর হস্তে গুলী ভরা রিভলভার। বনহুরেরই রিভলভার সেটা। নূরী রিভলভার ঠিক রেখে পিছু হটতে থাকে।

নাসরিনও নূরীর সঙ্গে দরজার দিকে পা বাড়ায়।

রহমান ব্যাপার দেখে একেবারে হতবাক বিস্মিত হয়ে গেছে। কোনো কথা সে উচ্চারণ করতে পারছে না। সত্যিই কি নূরীর হাতে সর্দার আর সে বন্দী হতে চলেছে। বারবার সে তাকাচ্ছে নূরীর হাতে রিভলভারখানার দিকে।

নূরী প্রায় ক্যাবিনের দরজার কাছে এসে পড়েছে।

হঠাৎ বনহুর হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ......

মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেলো নূরী আর নাসরিন।

রহমানও থ' হয়ে গেলো যেন।

বনহুর হাসি থামিয়ে বললো—রিভলভারে গুলী থাকলে তো গুলী ছুঁড়বে। রিভলভার ফাঁকা।

নূরী তাড়াতাড়ি রিভলভারে গুলী আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য রিভলভারে গুলী রাখার স্থানে দৃষ্টি দিতেই বনহুর খপ্ করে নূরীর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিলো, তারপর হেসে বললো—দস্যু বনহুরের রিভলভার কোনোদিন গুলী শূন্য থাকে না, বুঝলে?

নূরীর মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে উঠেছে, ভেবেছিলো সে, বনহুর আর রহমানকে বন্দী করে ওরা মজা দেখবে, কিন্তু তা সফল হলো না। বনহুরের কাছে হার মানতে হলো সর্বতঃভাবে।

বনহুর বললো—যাও, ক্ষমা করে দিলাম।

নূরী ক্রুদ্ধভাবে একবার বনহুরের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

নাসরিনও অনুসরণ করলো তাকে।

বনহুর হাত থেকে রিভলভারখানা টেবিলে রেখে সোফায় বসে পড়লো, তারপর বললো—রহমান, আমাদের যাত্রার পূর্বেই ওরা জাহাজে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। আমি জেনেও ওদের নামিয়ে দেইনি। কিন্তু এখন ভাবছি এদের দু'জনকে নিয়েই হলো সমস্যা। কাহাতুর দ্বীপে পৌঁছতে আমাদের অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

আমিও তাই ভাবছি সর্দার। ওদের জন্যই এখন বেশি চিন্তা হচ্ছে।

এক কাজ কর।

বলুন সর্দার?

ওরা যে ড্রেসে জাহাজে আত্মগোপন করেছিলো ঐ ড্রেসেই ওদের থাকতে দাও। জাহাজের কেউ যেন জানতে না পারে, সেভাবেই ওরা থাকবে।

আচ্ছা সর্দার।

রহমান বেরিয়ে গেলো।

বনহুর সিগারেট ধরালো।

❑

নাসরিন আর নূরীর শরীরে ছিলো একই রকম ড্রেস। একই সঙ্গে পাকশালায় কাজ করতো ওরা। জাহাজে কেউ যেন ওদের আসল পরিচয় জানতে না পারে এজন্য রহমান তাদের সাবধান করে দিলো।

বনহুর আর রহমান ছাড়া কেউ জানলো না এ কথা।

সেদিন নূরী বনহুরের ক্যাবিনে খাবার নিয়ে গেলো না, একটা নিগূঢ় অভিমান তার মনকে শক্ত করে রাখলো। বনহুর শেষ পর্যন্ত তাকে এভাবে অপমান করলো, এর প্রতিশোধ না নিয়ে সে ছাড়বে না কিছুতেই।

নাসরিন অগত্যা রাতের জন্য খাবার নিয়ে গেলো সর্দারের ক্যাবিনে।

বনহুর তখন ক্যাবিনে ছিলো না, ক্যাবিনের বাইরে কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলো।

নাসরিন যখন টেবিলে সর্দারের জন্য খাবার সাজিয়ে রাখছিলো বনহুর সেই মুহূর্তে ক্যাবিনে প্রবেশ করে। পিছন থেকে নাসরিনকে নূরী মনে করে বনহুর ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে দেয়। পা টিপে এসে দাঁড়ায় নাসরিনের পিছনে, ধরে ফেলে ওকে।

সঙ্গে সঙ্গে নাসরিন চমকে ফিরে তাকায়।

বনহুর মুহূর্তে ছেড়ে দেয় নাসরিনকে।

বনহুর এতোখানি ভুল করবে সে নিজেও ভাবতে পারেনি! লজ্জিত হলো সে নাসরিনের কাছে!

নাসরিন আর দাঁড়াতে পারলো না সেও লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে। দ্রুত বেরিয়ে গেলো সে ক্যাবিন থেকে।

নাসরিনকে লজ্জিত বিব্রতভাবে ক্যাবিনে প্রবেশ করতে দেখে নূরী অবাক হয়ে এগিয়ে এলো তার পাশে, বললো—কি হয়েছে নাসরিন?

যা হবার নয়, তাই হয়েছে।

বল্‌না কি ব্যাপার?

সর্দার তোমাকে মনে করে আমাকে পিছন থেকে ধরে ফেলেছিলো... ... ...

তারপর ... ... তারপর? আগ্রহভরা কণ্ঠে বললো নূরী।

তারপর যেমন আমি ফিরে তাকিয়েছি অমনি সর্দার আমাকে ছেড়ে দিয়েছে—সত্যি, সর্দার এতো বেশি লজ্জিত হয়েছে কি বলবো! যাও না ভাই, তোমার জন্য একেবারে উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন ... ...

তাহলে বন্দী করে রাখার আদেশ দিতো না সে।

জানো না নূরী, সর্দার তামাশা করেছিলো, সত্যি সত্যি কি তোমাকে বন্দী করে রাখতে পারে! যাও ভাই নূরী, সর্দারের জন্য বড্ড মায়া হচ্ছে আমার।

মায়া হচ্ছে, তবে যা না তুই।

ছিঃ এ কেমন কথা বলছো নূরী?

নাসরিন, সর্দার তোকে ভুল করে ধরে ফেলেছিলো। কিন্তু আসলে কি সত্যিই ভুল?

নূরী!

নাসরিন, তুই অস্বীকার করতে পারবি না, একদিন সর্দারকে তুই ভালবাসতিস্ ... ...

নূরী, এসব কি বলছিস্ বল্‌তো? সত্যি আমি ... ..

জানি, তুই না জানার ভান করেছিস্। আজও তুই তার এতোটুকু স্পর্শ পাবার জন্য লালায়িত তাকি আমি বুঝি না।

নূরী, চুপ কর, চুপ কর বলছি। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। সর্দার ভুল করে আমাকে ধরে ফেলেছিলো।

ভুল! ভুল না চাই ... ... নূরী নাসরিনকে ধরে ঠাই ঠাই করে চড় বসিয়ে দেয় তার গালে!

হঠাৎ নূরীর হাতখানা ধরে ফেলে কে যেন।

নূরী চমকে উঠে, বনহুরের হাতের মুঠায় তার হাতখানা আটকে গেছে যেন। নূরী তাকায় বনহুরের দিকে তীব্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে।

বনহুর শান্ত গম্ভীর স্বরে বলে—নূরী, এসব কি পাগলামি করছো?

পাগলামি নয়, নাসরিনকে তার কার্যফলের জন্য শিক্ষা দিচ্ছি।

এতো অবুঝ আর ছেলেমানুষ তুমি? ওর কোনো অপরাধ নয়, যদি অপরাধ হয়ে থাকে সে অপরাধ করেছি আমি।

তোমাকেও আমি শাস্তি দেবো।

হাসলো বনহুর—বেশ তো, আমাকেই তুমি শাস্তি দিও এবার দু'জনা হাতে হাত মিলাও। কারণ নাসরিন তোমার বান্ধবী।

নাসরিনের সঙ্গে হাতে হাত মিলাতে বাধ্য হলো নূরী।

বনহুর বললো—খবরদার, আর যেন এমন ঝগড়া না হয়, তাহলে আমি সমুচিত শাস্তি দেবো।

বনহুর কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে।

হঠাৎ নাসরিন বলে উঠলো—নূরী, আমাকে মাফ্ করে দাও?

নাসরিনের কথায় নূরীর মন সিক্ত হয়ে উঠলো, নাসরিনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো—তুই আমাকে মাফ কর নাসরিন। আমি তোকে ভুল বুঝেছিলাম। নূরীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা অশ্রু।

এমনি ঝগড়া নূরী আর নাসরিনের মধ্যে প্রায়ই যে হতো না, তা নয়। উভয়ে ছিলো সমবয়সী, কাজেই মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে সামান্য ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য ঘটতো, আবার মিলনও হতো অল্প সময়ে।

আজও নূরী আর নাসরিনের মধ্যে ভাব জমে উঠলো কিছুক্ষণেই। আবার হাসি গল্পে মেতে উঠলো ওরা।

একই ক্যাবিনে নূরী আর নাসরিন শয়ন করে, এমন কি একই বিছানায় একজনের মনের কথা প্রকাশ করে আর এক জনের কাছে।

রহমান কিন্তু সব সময় আসে এ ক্যাবিনে, খোঁজ-খবর নেয়। নূরী পাশে থাকায় নিবিড় করে পায় না রহমান নাসরিনকে উস্ খুস্ করে ওর মন।

নূরী সব বুঝে, হাসে সে মনে মনে। কখনও ওদের দু'জনাকে মিশবার সুযোগ দিয়ে পাকশালায় গিয়ে সময় কাটায়। নূরী নিজেকে এবার শক্ত করে নিয়েছে, একটিবারের জন্য সে বনহুরের ক্যাবিনে যায়নি বা ধরা দেয়নি। দেখতে চায় কতক্ষণ বনহুর নিজেকে শক্ত করে রাখতে পারে। আড়াল থেকে সে সব সময় লক্ষ্য রেখেছে কখন কি করে বনহুর।

যতই নূরী নিজকে কঠিন বা শক্ত করে রাখুক কিন্তু মনে সে ভীষণ অস্থিরতা বোধ করে। বনহুরের সান্নিধ্য যখন তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে তখন নূরী ছুটে যায় বনহুরের ক্যাবিনের পাশে। আড়াল থেকে দেখে, তারপর আবার ফিরে আসে নাসরিনের কাছে।

যতই দিন যায় ততই নূরীর মন অভিমানে ভরে উঠে। রহমান নাসরিনের সঙ্গে মিশবার জন্য কত রকম ছলনা খুঁজে বেড়ায়। কেমন করে ওকে কাছে পাবে, কেমন করে দুটো কথা বলবে, সব সময় এই সুযোগ সন্ধান করে। আর বনহুর। কই, একটি বারের তরেও তো তার পাশে এলো না বা তাকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল হলো না। নূরী মনে মনে ফন্দী আঁটতে লাগলো—কেমন করে বনহুরকে সে জব্দ করবে। ওকে জব্দ করতে পারলে সে যেন শান্তি পাবে।

বনহুর গভীর রাতে ডেকে গিয়ে দাঁড়াতো, আপন মনে ভাবতো আর সিগারেটের পর সিগারেট পান করতো। কি ভাবতো সে কথা একমাত্র সে নিজে ছাড়া কেউ জানে না।

প্রতিদিনের মত বনহুর সমস্ত জাহাজখানাকে প্রদক্ষিণ করে ডেকে এসে দাঁড়ালো। কোনো কোনো দিন রহমানও থাকতো তার পাশে। আজ রহমান নেই, বনহুর একা।

বনহুর যখন ডেকে দাঁড়িয়ে সিগারেট পান করে চলেছে, তখন নূরী নিজ ক্যাবিনে শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো, নাসরিনের দিকে তাকিয়ে দেখলো সে ঘুমাচ্ছে। ক্যাবিনের একপাশে গিয়ে আড়াল থেকে বের করে আনলো একটা মদের বোতল।

নূরী আবার তাকালো নাসরিনের দিকে, নাসরিন জেগে উঠবে না তো?

কিন্তু নূরী যা ভয় পাচ্ছে আসলে তাই, নাসরিন ঘুমের ভান করে সব দেখছিলো। নূরী যখন শয্যা ত্যাগ করলো তখন নাসরিনের বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করে উঠলো। কারণ আজ নূরীর মধ্যে কেমন যেন একটা চঞ্চলতা লক্ষ্য করেছে সে। সে কারণেই ঘুম পেলেও ঘুমাতে পারেনি নাসরিন।

নূরী নাসরিনের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর বোতলটা খুলে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে দিলো নিজের শরীরে, চোখেমুখেও ছিটিয়ে দিলো খানিকটা!

নাসরিন একটা উৎকট গন্ধ নাকে অনুভব করলো, চমকেই শুধু উঠলো না শিউরে উঠলো নাসরিন! চাদরের তলা হতে সজাগভাবে দেখতে লাগলো কি করে সে।

আজ নূরীর দেহে ছিলো তার নিজস্ব ড্রেস—ঘাগড়া, ব্লাউজ আর ওড়না। বিশেষ করে রাতের বেলায় সে এই ড্রেস পরতো। কারণ রাতে তাদের ক্যাবিনে অন্য কোনো অনুচর আসতো না!

নূরী নিজের চুলগুলো এলোমেলো করে নিলো, তারপর অতি লঘু হস্তে ক্যাবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

নূরী ক্যাবিন থেকে বের হতেই নাসরিনও শয্যা ত্যাগ করে নেমে পড়লো। সেও ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করে অনুসরণ করলো নূরীকে।

ডেকের দিকে এগিয়ে চললো নূরী।

বনহুর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে রেলিং-এর পাশে এসে দাঁড়ালো।

আড়ালে লুকিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলো নাসরিন, তবে কি নূরী সাগরবক্ষে লাফিয়ে পড়বে। পা হতে মাথা পর্যন্ত তার যেন ঠাণ্ডা হয়ে এলো মুহূর্তে।

হঠাৎ নূরী আপন মনে কি যেন বলে উঠলো, নাসরিন স্পষ্ট বুঝতে পারলো না!

ওদিকে বনহুরের কানেও পৌঁছলো নূরীর জড়িত চাপা কণ্ঠস্বর। বিস্মিত হলো সে, কারণ এতো রাতে রেলিং-এর পাশে নারীকণ্ঠ কেন? বনহুর হাতের সিগারেটটা সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করে দ্রুত এগিয়ে এলো।

ডেকের এদিকটা বেশ অন্ধকার। বনহুর দেখতে পেলো, কে যেন রেলিং থেকে সাগরবক্ষে লাফিয়ে পড়ার জন্য ঝুঁকে পড়েছে।

বনহুর তাকে চিনতে না পারলেও ছুটে গিয়ে ধরে ফেললো বলিষ্ঠ হস্তে। সঙ্গে সঙ্গে মদের উৎকট তীব্র একটা গন্ধ তার নাকে প্রবেশ করলো, সে সঙ্গে নারীকণ্ঠে জড়িত-স্বর— ছেড়ে দাও আমাকে ...... মরতে দাও ... ...

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো—নূরী তুমি? তুমি.......

কে - - -হুর - - -ছেড়ে দাও আমাকে। ছেড়ে দাও - -

না! তুমি মদ খেয়েছো?

বলবো না - - - তুমি আমাকে ছেড়ে দাও - - - ছেড়ে দাও বলছি ... ... আমাকে মরতে দাও ... ...

বনহুর নূরীর কথায় আর কোনো জবাব না দিয়ে বা কোনো প্রশ্ন না করে ওকে টানতে টানতে নিজের ক্যাবিনে নিয়ে আসে।

নাসরিন কিন্তু আড়াল থেকে সব দেখছিলো। বনহুর যখন নূরীকে তার ক্যাবিনের দিকে নিয়ে গেলো তখন সে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রইলো। ওরা অদৃশ্য হতেই নাসরিন এসে দাঁড়ালো বনহুরের ক্যাবিনের শার্শীর পাশে। যেখান থেকে সে সব শুনতে এবং দেখতে পাবে, এমনি জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর নূরীকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে ক্যাবিনে প্রবেশ করলো, তারপর দরজা বন্ধ করে দিলো ভিতর থেকে।

নূরী তখন মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে, ঢুলু ঢুলু করছে তার দেহটা। যদিও সে মদ পান করেনি তবু মদের গন্ধে তার মাথাটার মধ্যে যেন ঝিমঝিম করছে। আর যেন সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো না।

বনহুর দাঁতে অধর দংশন করে এগিয়ে যায় নূরীর দিকে, গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠে—নূরী, আমি ভাবতেও পারিনি তুমি এতোখানি অধঃপতনে গেছো! এতোখানি নিচে নেমে গেছো তুমি... ...

নূরী হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বনহুর চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ফেললো ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুমি মদ পান করেছো? এতোটুকু বাধলো না ঐ পদার্থ গলধঃকরণ করতে?

নূরী এবার ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো—না, আমি যত খুশি খাবো, তুমি পারবে না আমাকে বাধা দিতে। আমি যত খুশি.......

কি বলছো, তুমি মদ পান করবে?

হাঁ। আমি যা খুশি তাই করবো। কেন, কেন তুমি আমাকে আজ মরতে দিলে না?

নূরী! বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে নামটা উচ্চারণ করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলো সে ওর গালে।

নূরী টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলো মেঝেতে।

নাসরিন এই মুহূর্তে নিশ্চুপ থাকতে পারলো না, সে ক্যাবিনের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলো—দরজা খুলুন সর্দার, দরজা খুলুন, সর্দার দরজা খুলুন.......

বনহুর নাসরিনের কথা শুনতে পেয়ে দরজা খুলে দিলো।

নাসরিন ক্যাবিনে প্রবেশ করে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—সর্দার, নূরী মদ খায়নি। মদ খায়নি সে। নূরী মিথ্যা কথা বলেছে।

বনহুর অবাক হয়ে তাকালো নাসরিনের দিকে।

নাসরিন বলে চলেছে—আপনি বিশ্বাস করুন, নূরী মদ খায়নি।

বনহুর রাগত কণ্ঠে বললো—নাসরিন, আমাকে ভুল বুঝাতে চেষ্টা করো না। মদ খায়নি তবে ওর সমস্ত দেহে মদের গন্ধ কেন?

সর্দার, নূরী মিথ্যা কথা বলছে, সে মদ নিয়ে নিজের শরীরে মেখে আপনাকে ধোকা দেবার চেষ্টা করেছে। আমি সব দেখেছি সর্দার, আমি সব দেখেছি.......

বনহুরের মুখ ধীরে ধীরে প্রসন্ন হয়ে আসে, ফিরে তাকায় সে নূরীর দিকে।

নূরী তখন মেঝেতে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।

নাসরিন কথাগুলো বলে বেরিয়ে যায় সর্দারের ক্যাবিন থেকে।

বনহুর এগিয়ে আসে নূরীর পাশে, এতোক্ষণে সব স্পষ্ট হয়ে যায় তার কাছে। নূরী তাকে ধোকা দেবার জন্যই এই ফন্দি এঁটেছে। বনহুর হাঁটু গেড়ে বসে ডান হাতের আংগুল দিয়ে ওর চিবুকটা উঁচু করে ধরে। একটা আত্মতৃপ্তি ভরা স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠে তার ঠোঁটের ফাঁকে। বলে বনহুর—আমাকে ধোকা দিতে গিয়ে নিজেই চরম আঘাত পেলে, কেমন?

নূরী বনহুরের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বললো—যাও, কোনো কথা বলো না আমার সঙ্গে। আমি খারাপ, আমি যা'তা......আমি নীচ.......

বনহুর নূরীকে তুলে দাঁড় করিয়ে টেনে নেয় কাছে, বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে—আমি তোমাকে খারাপ বা যা'তা বলিনি। বলেছি ঐ সব খারাপ জিনিস তুমি পান করেছো কেন?

—না, আমি শুনবো না কোনো কথা। ছেড়ে দাও আমাকে। ছেড়ে দাও বলছি--------

উঁ হুঁ। হাতের মুঠায় যখন এসেছো তখন মুক্তি নেই। এতো সহজে ছেড়ে দেবো তোমায়? বনহুর এমনভাবে কথাগুলো বললো যেন সেও নেশা পান করে মাতাল বনে গেছে।

বনহুরের কথা বলার ভঙ্গী দেখে নূরীরও অভিমান মুছে গেলো মন থেকে, হাসি পেলো ওর। বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে হাসতে লাগলো সে ফিক্ ফিক্ করে।

চাপা হাসির আবেগে নূরীর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। বনহুর মনে করলো, সে বুঝি কাঁদছে, তাই বনহুর ওর পিঠে মাথায় সস্নেহে হাত

বুলিয়ে বললো—নূরী, কেঁদো না, আমাকে তুমি শাস্তি দাও। যা খুশি করতে চাও, করো।

এবার নূরী মুখ তুললো—যে শাস্তি দেবো তা তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে।

হাঁ রাজি।

কান ধরো। ধরো কান বলছি?

আচ্ছা ধরলাম - - - দস্যু সম্রাট বনহুর একটি নারীর কাছে অপরাধীর মত কান ধরে দাঁড়ালো।

যদিও নূরীর বড্ড হাসি পাচ্ছিলো তবু সে গম্ভীর হয়ে বললো—বলো আর কোনো দিন তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখবো না। বনহুর কান ছেড়ে দিয়ে বলিষ্ঠ বাহু দু'টি দিয়ে জড়িয়ে ধরলো নূরীর কোমল দেহটা, তারপর বললো—আর কোনো দিন তোমাকে দূরে যেতে দেবো না। দেবো না, দেবো না।

যাও, এতো দুষ্ট তুমি। ছাড়ো! ছাড়ো বলছি........

উঁ হুঁ - - - সেটি হচ্ছে না। বনহুর ক্যাবিনের সুইচ অফ্ করে ক্যাবিন অন্ধকার করে ফেলে।

❑

পাশপাশি শুয়ে আছে নূরী আর নাসরিন!

নূরীর চোখেমুখে ফুটে উঠেছে খুশির উচ্ছ্বাস!

নাসরিন মুখ টিপে হাসে—সর্দারকে খুব জব্দ করবে ভেবেছিলে কিন্তু নিজেই তুমি জব্দ হয়েছো শেষ পর্যন্ত - - - -

চুপ কর নাসরিন।

চুপ করবো কেন, আমি যদি আসল কথাটা না বলতাম তাহলে সর্দার ভাবতো, সত্যি তুমি মদ খেয়েছো।

তাতে আমার বয়েই যেতো।

সর্দারকে তুমি আজও বুঝলে না নূরী। তার মত পুরুষ আমি কোনোদিন দেখিনি! তার মনে তোমার সম্বন্ধে যদি কোনো সন্দেহের ছোঁয়া লাগে তাহলে কি হবে জানো? সে ভুল তুমি কোনোদিন মুছে ফেলতে পারবে না।

নাসরিন, জানি সব জানি কিন্তু কেন যেন ওর উপর আমার রাগ হয়। ওকে ব্যথা দিলে আমি যেন শান্তি পাই।

নূরী।

হাঁ, ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না, আবার ওকে আমি কষ্ট না দিলে স্বস্তি পাই না। তাই মাঝে মাঝে ওকে কষ্ট দিই - - - একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে আবার নূরী—নাসরিন, বনহুর আমার জীবন! নূরী শুয়েছিলো, উঠে বললো—তোকে আজ কয়েকটা কথা বলবো নাসরিন।

নাসরিনও উঠে বসলো শয্যায়, বললো—বলো?

যে কথা আজও আমি কাউকে বলিনি, আজ তোকে বলবো। জানিস তো, আমি দস্যু কালু খাঁর বিশ্বস্ত অনুচর হোসেন আলীর কন্যা?

জানি একথা।

কাজেই আমার জন্ম কালুখাঁর আস্তানায় তাও জানিস?

জানি।

কালুখাঁর আস্তানায় জন্ম, সেখানেই বড় হয়েছি। যেদিন থেকে জ্ঞান হয়েছে দেখেছি বনহুরকে। যদিও সে আমার চেয়ে বেশ কিছু বড় ছিলো তবু ওকে খেলার সাথী হিসেবেই পেয়েছিলাম। একসঙ্গে খেলা করতে করতে শিখলাম শিকার করা। শিকার করা থেকে নদীতে সাঁতার কাটা—সবসময় ওর সঙ্গী ছিলাম আমি। এ সবই জানিস তুই। আরও জানিস, বনহুর আমার সঙ্গ ছাড়া কিছু বুঝতো না। থামলো নূরী।

নাসরিন উদগ্রীব হয়ে শুনে চলেছে।

নূরী বালিশে ঠেশ দিলো, আংগুল দিয়ে নিজের ওড়নার আঁচলটা ঠিক করে নিলো কাঁধের উপর, তারপর আবার বলতে শুরু করলো—বনহুরকে আমি যেমন ভালবাসতাম, তেমনি ভয়ও করতাম খামখেয়ালী বলে। ওর সঙ্গে ঝগড়াও হতো আমার মাঝে মাঝে। ও কোনোদিন রাগ করে থাকতে পারতো না। একটুতেই রাগ করতাম আমি। এজন্য অনেক সময় বনহুরের হাতে চড়-থাপ্পড়ও খেতে হয়েছে।

সে তো আমিও দেখেছি অনেকদিন।

হাঁ দেখেছিস! আর দেখেছিস ওর হাতে মার খেয়ে কেঁদেছি। তখন মনে হয়েছে আর যাবো না ওর কাছে, কিন্তু পারিনি—আমিই ছুটে গিয়েছি রাগ-অভিমান ভুলে। স্বচ্ছ স্বাভাবিকভাবে মিশেছি ওর সঙ্গে। একদিন বনহুর আর আমি ঝর্ণার জলে সাঁতার কাটছিলাম—আমার রাজহংসীটিকে যে ধরতে পারবে সেই জয়ী হবে। আমি হাল্কাভাবে সাঁতার কেটে এগুচ্ছি। বনহুর আমার কিছুটা পিছনে রয়েছে। সম্মুখে হাতকয়েক দূরে রাজহংসী ভেসে আছে। আমি প্রায় হাঁসটিকে ধরবো, ঠিক সে মুহূর্তে বনহুর আমাকে আটকাবার জন্য ধরে ফেললো। ওর বলিষ্ঠ হাতের ছোঁয়া আমার সমস্ত দেহে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি জাগালো, ও আমাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁসটাকে ধরে ফেলে জয়ের উল্লাসে আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

তারপর নূরী?

সেদিন আমি ওকে নতুন রূপে আবিষ্কার করলাম। তীরে উঠে এলাম আমরা উভয়ে, কিন্তু ওর দিকে চাইতে আমার কেমন যেন লজ্জা করছিলো।

তারপর বলো?

আমার অন্তর দিয়ে ওকে আমি অনুভব করলাম। সেদিন সমস্ত রাত আমি ঘুমাতে পারিনি। সর্বক্ষণ আমার দেহ-মনে বনহুরের স্পর্শ আলোড়ন জাগাচ্ছিলো। এরপর থেকে আমি ওর সঙ্গে সহজভাবে মিশতে চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। বনহুরকে যতই দেখেছি ততই ভাল লেগেছে, আরও দেখতে ইচ্ছা করেছে। নূরী আনমনা হয়ে গেলো ক্ষণিকের জন্য, অতীতে ফেলে আসা সে দিনগুলো বুঝি স্মরণ হয়েছে তার।

একটু চুপ থেকে বললো নূরী—কিন্তু বনহুরের মধ্যে দেখিনি কোনো পরিবর্তন। যেমন স্বাভাবিক ছিলো তেমনি রইলো সে পাষাণ দেবতার মত। আমি কত করে ওকে বুঝাতে চেষ্টা করেছি, কতভাবে জানাতে চেয়েছি, প্রেম-ভালবাসা বলে একটি জিনিস আছে। আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, হতাশায় ভরে গেছে মন - - - -

আজ এসব কথা আমাকে শোনোচ্ছো কেন নূরী?

কি জানি কেন যেন আজ পুরোন কথাগুলো বারবার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বনহুরের সঙ্গে অতীতের স্মৃতিগুলো, এসব বলতে বড় আনন্দ লাগছে আমার। আজ আমি কত সুখি তোকে তা বুঝিয়ে বলতে পারবো না। যে

সম্পদ আজ আমার হাতের মুঠায়, তা বুঝি কেউ কোনো দিন পায়নি। দস্যু বনহুর আমার, একান্তই আমার সে ————

নূরী শয্যায় শুয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে।

নাসরিন ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—

নূরী, তোর নারীজন্ম সার্থক হয়েছে।

হাঁ, আমার নারীজন্ম সার্থক।

কয়েকদিন অবিরত জাহাজ 'শাহী' চলার পর তুহান দ্বীপে এসে পৌঁছলো। তুহান বন্দরে 'শাহী' নোঙ্গর করলো। বেশ কিছু দিন জাহাজের মধ্যে কাটিয়ে বনহুরের অনুচরগণ হাঁপিয়ে উঠেছিলো। নূরী, নাসরিন এরাও দ্বীপে নামার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো।

বনহুর স্বাভাবিক ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নিলো, সেও অবতরণ করবে তুহানে।

নূরী এসে বনহুরকে ধরে বসলো— হুর, আমি আর নাসরিনও নামবো কিন্তু তুহানে।

বনহুর বললো—অজানা দ্বীপ, কি দরকার এখানে নেমে?

তা হবে না, বারণ করলে শুনবো না কিন্তু আমরা।

হঠাৎ যদি কোনো বিপদে পড়ো তখন কি হবে?

তুমি পাশে থাকতে আমি কোনো বিপদকে ভয় করি না হুর।

বেশ, নামতে চাও নেমো। কিন্তু কেউ যেন চিনতে বা বুঝতে না পারে তোমাদের আসল রূপ। কথাটা বলে বনহুর নূরীর গণ্ডে মৃদু চাপ দিলো।

সে মুহূর্তে রহমান সর্দারের ক্যাবিনে প্রবেশ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো, নূরী রহমানকে দেখে ফেলেছিলো, তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে গেলো বনহুরের ক্যাবিন থেকে।

বনহুর ডাকলো—এসো।

রহমান বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো, কুর্ণিশ জানিয়ে বললো—সর্দার, তুহান দ্বীপে বেশিক্ষণ জাহাজ নোঙ্গর না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে ফারহান।

আমারও তাই ইচ্ছা, কাজেই যারা দ্বীপে অবতরণ করবে তারা যেন শীঘ্রই জাহাজে ফিরে আসে, সেমত নির্দেশ দাও।

রহমান চলে গেলো।

বনহুর, নূরী আর নাসরিনসহ তুহানে অবতরণ করলো।

মনোরম বন্দর তুহান দ্বীপ। মুগ্ধ হলো সবাই।

নূরী আর নাসরিন বনহুরের সঙ্গেই রইলো, যদিও তাদের দেহে পুরুষের ড্রেস ছিলো তবু সাবধানে রইলো তারা।

তুহান থেকে আবার জাহাজ 'শাহী' সাগরবক্ষে ভাসলো। বনহুরের অনুচরদের মধ্যে জেগে উঠলো এক নতুন প্রাণশক্তি। সবাই আনন্দমুখর হয়ে নিজ নিজ কাজে যোগদান করলো।

সবচেয়ে মুখর হয়ে উঠেছে নূরী আর নাসরিন। উচ্ছল আনন্দে ভরে উঠেছে ওদের মন। বাবুর্চিখানায় কাজ করে আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের তলায় ডেকে গিয়ে বসে। যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠে জাহাজ 'শাহীর' বুকে তখন নূরী প্রতীক্ষা করে বনহুরের, আর নাসরিন করে রহমানের জন্য। উভয়ে উভয়ের আকাঙ্ক্ষিত জনকে পাশে পেয়েছে, নেই কোনো দ্বিধা, নেই কোনো বিষণ্নতা বা চিন্তার ছাপ।

তুহান সাগর হয়ে 'শাহী' একদিন আরাকান এসে পৌঁছলো। বনহুর আদেশ দিয়েছে, আরাকান বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করবে না।

কাজেই নাবিকগণ এবং 'শাহীর' কর্মচারীবৃন্দ আপন আপন ডিউটিমত কাজ করে চলেছে।

আরাকান হয়েই তাদের জাহাজ 'শাহী' চলেছে কাহাতুর দ্বীপের দিকে। জাহাজে প্রত্যেকের মনে এখন নানারকম চিন্তার উদ্বেগ হচ্ছে। না জানি সেখানে তাদের কেমনভাবে কাটবে। বনহুরের মনের অবস্থা খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে না, কারণ তার কতগুলো অনুচর আজ তাদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে।

বনহুর ডেকে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো সেদিন তার অনুচরগুলোর কথা। তাদের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছবার পূর্বেই কতগুলো জীবন নির্মমভাবে নিঃশেষ হয়ে গেলো।

নানা চিন্তা ছাপিয়ে হঠাৎ একখানা মুখ ভেসে উঠলো বনহুরের মনে, মায়াময় স্নিগ্ধ সুন্দর দীপ্ত একটি মুখ—নীহার। আনমনা হয়ে যায় বনহুর, নীহারের সঙ্গে স্মৃতিগুলো ভেসে উঠে তার মানসপটে। এরকম এক সন্ধ্যায় বনহুর কর্মক্লান্ত ঘর্মাক্ত দেহ নিয়ে ইঞ্জিন ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো ডেকের পাশে। সমস্ত শরীর তেল-কালি মাখা, জামা-

কাপড়গুলোও তেল-কালিতে জপজপ করছিলো। বনহুর তাকিয়েছিলো সাগরবক্ষে ফেনিল জলরাশির দিকে। হঠাৎ পদশব্দে ফিরে তাকাতেই বিস্মিত হয়েছিলো, মালিক আবু সাঈদের কন্যা নীহারকে তার পাশে দেখে। বনহুর তখন সামান্য এক নাবিক মাত্র। নীহার তার কোমল হাতের মুঠায় চেপে ধরেছিলো বনহুরের কালিমাখা বলিষ্ঠ হাতখানা, আবেগভরা কণ্ঠে বলেছিলো—আলম, তোমাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি- - -?

বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, চমকে উঠে ফিরে তাকায়—কে?

অমন করে চমকে উঠলে কেন হুর? কখন যে নূরী তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো, বুঝতে পারেনি বনহুর।

নূরীর কথায় কোনো জবাব না দিয়ে রেলিং-এ হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে আগুন ধরালো সে।

নূরী বললো—তন্ময় হয়ে কি ভাবছিলে?

বনহুর একরাশ ধুঁয়ার ফাঁকে তাকালো নূরীর মুখে, একটু হেসে বললো—তোমার মত আর একজনের কথা মনে পড়ছে আজ।

কে সে ভাগ্যবতী যার কথা দস্যুসম্রাটের মনকে আজ হঠাৎ বিচলিত করে তুলেছে?

বনহুর তারাভরা আকাশের দিকে তাকালো, মিছামিছি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করার ভান করে বললো—ধনকুবের ভূতত্ত্ববিদ আবু সাঈদের কন্যা নীহার!

হুঁ বুঝেছি। তুমি তাকে ভালবেসেছিলে?

আমি নয়, সে-ই তাকে ভালবেসেছিলো।

তুমি তার প্রতিদান দাওনি?

কিছু কিছু.......একটু নীরব থেকে বললো আবার বনহুর—বেচারী নীহারের জন্যই আমি আর কেশব সেদিন পূর্নজন্ম লাভ করেছিলাম নূরী। তার দয়া ছাড়া সেদিন আমাদের বাঁচাবার কোনো পথ ছিলো না! কিন্তু তার সীমাহীন ভালবাসার পূর্ণ প্রতিদান দেয়া আমার সম্ভব হয়নি......

কেন? কেন তুমি তাকে........

এখানেই আমার দুঃখ নূরী, তুমি—আজও আমাকে বোঝোনি বা চেনোনি।

নূরী বনহুরের ব্যথাভরা কণ্ঠে ব্যথিত হলো। বনহুরের বুকে মাথা রেখে বললো—কে বলে আমি তোমায় জানি না, চিনি না? তোমার নূরী যদি

তোমায় না চেনে তবে কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না কোনোদিন। আমাকে মাফ করো।

নূরী.....আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠে বনহুর। তারপর ওর মুখখানা অন্ধকারে নিজের মুখের কাছে তুলে ধরে।

নূরীর আনন্দ তো এখানেই, বনহুরের সান্নিধ্য তাকে আত্মহারা করে ফেলে।

হঠাৎ নাসরিন এসে পড়ে, একটু কেশে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দেয়।

বনহুর আর নূরী উভয়ে সজাগ হয়ে সরে দাঁড়ায়।

নূরী লজ্জায় মাথা নত করে।

নাসরিন বলে—নূরী, এদিকে ক্যাপ্টেন বোরহান আর বৈজ্ঞানিক ফারহান আসছে।

বনহুর শান্ত-স্বরে বললো—যাও নূরী, তোমরা ক্যাবিনে যাও।

নূরী আর নাসরিন উভয়ে চলে গেলো।

একটু পরেই বোরহান আর ফারহান এসে পড়লো সেখানে। কোনো প্রয়োজনীয় আলোচনার জন্যই তারা এসেছে সর্দারের কাছে।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। তারপর সিগারেট কেসটা সঠিক জায়গায় রাখলো।

ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে হন্তদন্তভাবে ক্যাপ্টেন বোরহান এবং বৈজ্ঞানিক ফারহান এসে দাঁড়ালো। উভয়েরই চোখেমুখে একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ বিদ্যমান।

বনহুর ডেকের অন্ধকারে তাদের মুখোভাব স্পষ্ট দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলো, কোনো দুঃসংবাদ বহন করেই তাদের আগমন হয়েছে। বনহুর কিছু প্রশ্ন করার পূর্বেই বলে উঠলো ক্যাপ্টেন—সর্দার, আবহাওয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক! আজ রাতে সামুদ্রিক ঝড় শুরু হতে পারে।

বনহুরের মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না, বলে সে—আমারও সে রকম মনে হচ্ছিলো। কারণ, বিকেল থেকেই আবহাওয়াটা কেমন যেন থমথমে ভাব ধারণ করেছে। এসব সমুদ্রে প্রায় সাইক্লোন হয়ে থাকে।

বোরহান বলে উঠলো—সর্দার, সাইক্লোন তো বড় সাংঘাতিক!

অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক ঝড় সাইক্লোন। বললো বৈজ্ঞানিক ফারহান।

বনহুর বললো—তোমরা জাহাজে বিপদসংকেত জানিয়ে দাও এবং প্রত্যেককে সাইক্লোন ঝড়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে দাও।

আচ্ছা সর্দার।

বোরহান এবং ফারহান কুর্ণিশ জানিয়ে চলে গেলো।

বনহুর পা বাড়ালো ক্যাবিনের দিকে।

সে মুহূর্তে রহমানও ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছিলো, বললো—সর্দার, এখন উপায়? আমাদের জাহাজ বুঝি সাইক্লোনের সম্মুখীন হতে চলেছে। আবহাওয়া সংবাদে ঘোষণা করেছে— আজ রাতে ঝড় হতে পারে।

বনহুর বললো—উপায় কিছু নেই রহমান। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

রহমান বললো—সর্দার, এ মুহূর্তে কোনো দ্বীপে নোঙ্গর করতে পারলে আমরা কতকটা নিরাপদ হতে পারতাম।

গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর—অজানা কোনো দ্বীপে নোঙ্গর করে বিপদে পড়ার চেয়ে সাইক্লোনের কবলে পরে মৃত্যু অনেক শ্রেয় বুঝলে?

জাহাজ 'শাহী'র প্রতিটি ব্যক্তি সাইক্লোনের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলো। বিপদসংকেত ধ্বনি হচ্ছে মাঝে মাঝে।

নূরী আর নাসরিনের অবস্থা কাহিল, ওরা কোনোদিন সামুদ্রিক ঝড় সাইক্লোনের হাতে পড়েনি, তাই ভয়ে কুঁকড়ে গেছে একেবারে। বনহুরের পাশে পাশে রয়েছে ওরা দু'জনা সব সময়।

নূরীর ভয় বনহুরকে নিয়ে বেশি, জানে সে সাইক্লোন ঝড় শুরু হলে ওকে সে কিছুতেই আটকাতে পারবে না। তার প্রমাণ হচ্ছে নারুন্দীদ্বীপের জংলীদের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপার। নারুন্দীদ্বীপের সন্নিকটে পৌঁছবার পূর্বেই কৌশলে সে তাদের দু'জনাকে আটকে রেখেছিলো, না হলে তার কাজে বাধা পড়তো জানতো বনহুর। এবার বনহুর সুযোগ পাচ্ছে না ওদের বন্দী করার, কিন্তু ওদের ডেকে নিয়ে খুব করে বুঝিয়ে দিয়েছে, ঝড় শুরু হলে ওরা যেন সাবধানে থাকে।

বনহুর বললো—নূরী, সামুদ্রিক ঝড় সাইক্লোন, অতি ভয়ঙ্কর এ ঝড়, কাজেই তোমরা ক্যাবিনে চুপ চাপ থাকবে।

বললো নূরী— আর তুমি?

আমাকে ইঞ্জিন কক্ষে যেতে হবে নূরী।

না, তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না, তুমি আমার পাশে থাকবে।

তোমার পাশে থেকে সব সহ ডুবে মরতে হবে, এইতো........

নূরী বনহুরের বুকের কাছে জামার অংশ চেপে ধরে বলে—মরতে হয় দু'জনাই মরবো, তবু তোমাকে ছেড়ে দেবো না হুর।

পাগলামি করো না নূরী। ছেড়ে দাও আমাকে---

ওদিকে তখন জাহাজময় বিপদসংকেত ঘন্টা ধ্বনি হচ্ছে। দূরে—বহুদূরে মেঘ গর্জনের মত শোনা যাচ্ছে। আকাশ-আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে জমকালো মেঘে। সাঁ সাঁ করে বাতাস বইতে শুরু করেছে।

বনহুর বললো— আমাকে যেতে দাও নূরী। ঝড় এসে পড়েছে।

নূরী আরও জোরে বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরলো —না না, আমি এ মুহূর্তে ছেড়ে দেবো না।

নাসরিন থরথর করে কাঁপছে। বনহুর আর নূরীর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সে। রহমানের জন্য মনটা তার বড়ই অস্থির হয়ে উঠেছে, দুঃশ্চিন্তায় কালো হয়ে গেছে তার মুখমণ্ডল।

ঝড়ের বেগ বেড়ে উঠছে ভীষণভাবে।

জাহাজখানা দোল খাচ্ছে, মোচার খোলার মতো।

সমুদ্রের জলরাশি তীর বেগে ছুটে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে জাহাজের উপর।

সেকি ভীষণ তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছে।

এমন সময় ছুটে আসে রহমান ব্যস্ত সমস্ত হয়ে, ঝড়ের মধ্যে ঝড়ের বেগেই এসে প্রবেশ করে সে ক্যাবিনে। সমস্ত শরীর তার ভিজে চুপসে গেছে একেবারে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলো রহমান—সর্দার, সর্দার,—ইয়াকুব চাচা ইঞ্জিন মেশিনের মধ্যে পিষে গেছে---শীগগীর চলুন, না হলে জাহাজ এক্ষুণি তলিয়ে যাবে, এক্ষুণি তলিয়ে যাবে সর্দার---

বনহুর অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—বলো কি রহমান—ইয়াকুব ইঞ্জিনের মেশিনের মধ্যে পিষে গেছে?

হাঁ সর্দার, ঝড়ের দাপটে জাহাজের একটা মেশিন বিকল কার্যহীন হয়ে পড়েছিলো। ইয়াকুব চাচা সেটাকে তাড়াতাড়ি ঠিক করে নেবার জন্য মেশিনের চাকার মধ্যে প্রবেশ করেছিলো। ইয়াকুব চাচা মেশিনের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মেশিন চালু হয়ে যায়---

সর্বনাশ, তাহলে উপায়?

উপায় তো কিছুই দেখছি না সর্দার। জাহাজকে কোনো রকমে চালিয়ে নিয়ে চলেছে এখন নাবিক রহমত কিন্তু সে তো হেড নাবিক নয়, কাজেই--

আমাদের জাহাজ এখন ধরতে গেলে সম্পূর্ণ চালকবিহীন। রহমান, তুমি নূরী আর নাসরিনের দিকে লক্ষ্য রাখবে, আমি ইঞ্জিন ক্যাবিনে চললাম। বনহুর কথা শেষ করেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে।

নূরী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো—হুর---- হুর--যেওনা। যেওনা-- সেও ছুটে বেরিয়ে আসতে গেলো।

রহমান ধরে ফেললো নূরীকে—নূরী পাগলমি করোনা। এখন সর্দার যদি ইঞ্জিন ক্যাবিনে না যান তবে আমাদের সবাইকে ডুবে মরতে হবে। ইয়াকুব চাচা ছিলেন হেডচালক, কাজেই সে যখন নেই তখন বুঝতেই পারছো?

ওর যদি কোনো বিপদ ঘটে তখন কি হবে রহমান ভাই?

নূরী, খোদাকে স্মরণ করো তিনি ছাড়া কোনো উপায় নেই। তুমি তো জানো, সর্দার নিজে জাহাজ চালনায় দক্ষ, কাজেই তাঁর ভয়ের কোনো কারণ নেই।

কিন্তু আমার মন যে কেমন করছে রহমান ভাই। আমাকেও নিয়ে চলো, আমাকেও ইঞ্জিন ক্যাবিনে নিয়ে চলো।

সর্বনাশ হবে। সর্দার তাহলে আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। নূরী, চুপ করে থাকো।

নূরী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

নাসরিন আর রহমান ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

❑

এক সময় ঝড়ের বেগ থেমে এলো। আকাশ সচ্ছ হয়ে এলো ক্রমান্বয়ে। বিপদ সংকেত ধ্বনি আর হচ্ছে না। পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে, সূর্য উঁকি দেবে আর একটু পরে।

জাহাজ 'শাহী'র প্রত্যেকের মন থেকে ভয়-বিহ্বলতা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। কিন্তু হেড নাবিক ইয়াকুবের জন্য সকলেই বিষণ্ন হয়ে পড়েছে।

বনহুর নাবিক রহমতের হাতে ইঞ্জিনের ভার দিয়ে বেরিয়ে এলো ইঞ্জিন ক্যাবিন থেকে।

ডেকে এসে দাঁড়াতেই ক্যাপ্টেন বোরহানের গলা শোনা গেলো মাইকে, সে জানাচ্ছে—তাদের জাহাজ শুধু নিরাপদই নয়, ঝড়ের দাপটে তারা প্রায় কাহাতুর দ্বীপের সন্নিকটে এসে পড়েছে। কথাটা শুনে সবাই আনন্দ প্রকাশ করলো।

কিন্তু যখন ইয়াকুবের ক্ষত-বিক্ষত খণ্ড খণ্ড দেহটা এনে জাহাজের ডেকে রাখা হলো তখন সকলের মুখ করুণ আর ব্যথা-কাতর হয়ে উঠলো, দস্যুপ্রাণ হলেও তারা এ দৃশ্য যেন সহ্য করতে পারছিলো না।

বনহুর হাতের পিঠে চোখ মুছলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ তাদের শোক করার বা ভাবার সময় নেই। বনহুরের আদেশে ইয়াকুবের লাশ যত্ন সহকারে সমুদ্রগর্ভে ছেড়ে দেয়া হলো।

রাত শেষ হয়ে সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠলো সমস্ত পৃথিবী। কাহাতুর দ্বীপ এখন মাত্র কয়েক মাইল। বনহুর নিজে ডেকে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগলো।

রাতের ঝড়ের উচ্ছলতা এখন আর নেই। সমুদ্রগর্ভ শান্ত ধীরস্থির।

নূরী বনহুরের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনাবিল আনন্দে মন তার আত্মহারা। বনহুরকে ঠিক আগের মতই করে পেয়েছে বলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুরের জাহাজ 'শাহী' তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছলো।

জাহাজ নোঙ্গর করার আদেশ দিলো ক্যাপ্টেন বোরহান।

বনহুর বললো—তীর ছেড়ে অনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ নোঙ্গর করতে হবে, কারণ আমাদের জন্য কাহাতুরে অনেক বিপদ ওৎ পেতে আছে।

ফারহান বনহুরের কথা মতোই কাজ করতে লাগলো।

জাহাজ তীর ছেড়ে দূরে অপেক্ষা করবে, আর তারা বোট যোগে তীরে গমন করবে।

তীরে অবতরণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বনহুর নিজে দেখে-শুনে গুছিয়ে নিতে লাগলো।

প্রথম কাহাতুর দ্বীপে অবতরণ করবে দস্যু বনহুর, রহমান আর ফারহান। পরীক্ষা করে দেখবে, কোন্ পথে তারা অগ্রসর হলে জংলীদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে পারবে বা নিরাপদে তারা সেই কাহাতুর পাহাড়ে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবে।

বনহুর, রহমান, বৈজ্ঞানিক ফারহান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বোটে চেপে বসলো। বনহুরের দেহে শিকারী ড্রেস, দক্ষিণ হস্তে রিভলভার।

নূরী, নাসরিন এবং অন্যান্য সবাই জাহাজে অপেক্ষা করতে লাগলো। নূরী মনে মনে খোদার নাম স্মরণ করে চলছে।

বনহুর যেখানে বোট ভিড়াবার জন্য নির্দেশ দিলো সেখানে থেকে কাহাতুর পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

বোটখানা একসময় সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছলো।

নেমে পড়লো বনহুর, রহমান আর ফারহান, বোটচালক অনুচরটি বোটেই রইলো।

বনহুর, রহমান ও ফারহান তীরে অবতরণ করে এগিয়ে চললো। আজ আবার বনহুরের মনে পড়লো সাপুড়ে সর্দারের কথা। কঠিন বাস্তব একখানা মুখ। মাথায় ঝাকড়া চুল, কানে বালা, পরনে ফতুয়া আর আঁটসাট ধূতি। বলিষ্ঠ নিটোল কালো দেহ। বলেছিলো সেদিন সাপুড়ে সর্দার--আমার কোনো ছেলে নেই বাবুজি, তাই হামি তোকে হামার ছেলে মনে করি। তোকে হামি এমন এক জিনিস দিয়া যাইমু যা সাত রাজার ধন। হামার কোন ছেলে নাই বাবুজি, তুই হামার ছেলে। সাপুড়ে সর্দারের কথায় অবাক হয়ে গিয়েছিলো বনহুর সেদিন, ভেবেছিলো—বলেকি লোকটা! সাপুড়ে সর্দার তাকে অবাক হতে দেখে বলেছিলো---হামি যখন জোয়ান ছিলাম

তখন একদিন কাহাতুর নামে এক পাহাড়ে সাপ ধরতে গিয়েছিলাম। হামার বাপু সাথে ছিলো। ঐ দিন বনহুর আরও অবাক হয়ে বলেছিলো, কাহাতুর পাহাড়? সাপুড়ে সর্দার বলেছিলো---- হাঁ বাবুজি, কাহাতুর পাহাড় দিল্লী শহর হতে পাঁচশত মাইল দক্ষিণে--

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, ফারহান বলে উঠে —সর্দার ওদিকে তাকান---ওদিকে তাকান।

বনহুর আর রহমান তাকিয়ে দেখলো, গভীর জঙ্গল ভেদ করে দেখা যাচ্ছে, ফাঁকা এক স্থানে কতগুলো জংলী পুরুষ বর্শা আর বল্লম নিয়ে এগিয়ে আসছে। এক একজনকে ঠিক ছোট খাটো গরিলা বলেই মনে হচ্ছে।

কখন যে তারা এতো গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করেছে যেন খেয়ালই ছিলো না বনহুরের। বনহুর থামতে বললো রহমান ও ফারহানকে। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখতে লাগলো সে।

ফারহান বলে উঠলো—সর্দার, আমার মনে হচ্ছে, ওরা এদিকেই আসছে।

বনহুর কিছুক্ষণ জংলীদের ভালভাবে দেখে নিয়ে বললো —হাঁ, ঐ রকম মনে হচ্ছে। শীঘ্র গাছে উঠে পড়ো রহমান। মিঃ ফারহান, আপনিও উঠে পড়ুন।

বনহুর নিজেও একটা বৃক্ষের নিচে এসে দাঁড়ালো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা তিনজন গাছে উঠে গাছের পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে রইলো।

এদিকে হুম্ হুম্ শব্দ করে এগিয়ে আসছে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন জংলী পুরুষ। প্রত্যেকেই পশুর চামড়া পরে রয়েছে। মাথায় পালকের মুকুট।

ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে ওরা।

বনহুর বললো চাপাস্বরে—ওরা শিকারের অন্বেষণে বেরিয়েছে।

রহমান আর ফারহান তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

বনহুর পুনরায় বললো—কেউ কোনোরূপ শব্দ করো না যেন।

রহমান বললো—আচ্ছা সর্দার।

ততক্ষণে আরও এগিয়ে এসেছে জংলীদল। এখন প্রায় হাত চল্লিশ দূরে মাত্র রয়েছে তারা।

বৈজ্ঞানিক ফারহান কোনোদিন এভাবে জংলীদের সম্মুখীন হয়নি, সে তো কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

রহমান ভয় না পেলেও আশঙ্কা জাগলো মনে, হঠাৎ যদি কোনোক্রমে ওদের দৃষ্টি এদিকে চলে আসে তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। মৃত্যু হবেই ওদের হাতে।

ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে, জংলীদল কোনোদিকে না তাকিয়ে হুম্‌হুম্‌ শব্দ করে চলে গেলো সম্মুখ দিকে।

ওরা যখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো তখন বনহুর বললো—নেমে পড়ো এখন তোমরা।

বনহুর নিজেও গাছ থেকে নেমে পড়লো।

রহমান এবং ফারহান নেমে এগিয়ে এলো সর্দারের পাশে।

বনহুর বললো—জংলীরা শিকারের সন্ধানে গেছে। ওরা শীঘ্র ফিরবে বলে মনে হয় না। এ সুযোগে আমরা সেই গুপ্ত গুহায় যাবো, কিন্তু এ পথে নয়।

রহমান বললো—তাহলে কোন্ পথে যাওয়া যায়?

যেপথে একদিন আমি আর কেশব কাঠের ভেলা যোগে পালাতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই জলপ্রপাত হয়ে আমাদের আসল জায়গায় পৌঁছতে হবে। আজ যদি কেশব থাকতো তাহলে খুব ভাল হতো, সে পথ চিনে রেখেছিলো---কথা বলতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো বনহুর, বললো—চলো রহমান, পা চালিয়ে চলো।

বনহুর, রহমান আর ফারহান ফিরে এলো মোটর বোটে। মোটর বোটের স্পীড কমিয়ে দেয়া হলো কারণ মোটর বোটের শব্দ যেন জংলীদের কানে না যায়।

আবার যাত্রা শুরু হলো।

এবার বনহুরের 'শাহী' জাহাজ সেই গুপ্তগুহার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পাড়ি জমালো। কাহাতুর পাহাড়ের ঠিক বিপরীত দিকে এবার তারা নোঙ্গর করবে।

গোটা দু'দিন দু'রাত জাহাজ সমানে চলার পর সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলো যে স্থানে ভেলা থেকে আবু সাঈদের জাহাজ তাকে আর

কেশবকে উদ্ধার করে নিয়েছিলো। আরও কিছুদূর অগ্রসর হবার পর জাহাজ থেকে বনহুর সেই জলপ্রপাতের মুখ দেখতে পেলো।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো যেন বনহুর। সে পথের নির্দেশ দিতে লাগলো কোন্ পথে কেমনভাবে তারা জলপ্রপাতের অদূরে পৌছতে সক্ষম হবে।

•

❑

জাহাজ নোঙ্গর করলো জলপ্রপাতের অদূরে সমুদ্রমধ্যে। বনহুর তার দলবল নিয়ে তিনখানা মোটর বোট যোগে রওয়ানা দিলো। সঙ্গে গভীর জলের তলায় অবতরণ করার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সব গুছিয়ে নিলো আর রইলো মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। জংলীরা যদি আক্রমণ করে বসে তাহলে তাদের কবল থেকে যেন উদ্ধার পাওয়া যায়।

'শাহীতে' কয়েকজন অনুচর রইলো।

বাকি সব চললো বনহুরের সঙ্গে।

এ পথে একদিন বনহুর আর কেশব কাঠের ভেলাযোগে পালাতে বাধ্য হয়েছিলো। জংলী রাণী আচমকা আক্রমণ করে বসেছিলো তাকে। তারপর জংলী রাণী উচুঁ থেকে জলপ্রপাতের মধ্যে পড়ে পাথরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, সলিল সমাধি হয়েছিলো তার। আজ বনহুরের সব মনে পড়তে লাগলো।

জাহাজে প্রায় অনেকগুলো বোট এবং মোটর বোট ছিলো। বনহুর বলে গেলো যদি জাহাজে কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে বাকি বোটগুলি নিয়ে তারা যেন জাহাজ থেকে নেমে পড়ে এবং ওয়্যারলেসে তাকে জানিয়ে দেয়, কারণ এসব দিকে জলদস্যুর উৎপাত অনেক বেশি।

নূরী আর নাসরিন বনহুরের সঙ্গে রইলো।

শেষ পর্যন্ত নূরী আর নাসরিনের পরিচয় বনহুরের অনুচরগণ জেনে নিয়েছিলো। অবশ্য গোপন রাখার তেমন গুরুত্বপূর্ণ কারণও ছিলো না।

বনহুর দলবল নিয়ে একসময় সেই গুপ্ত গুহার পিছন ভাগে এসে পৌছতে সক্ষম হলো।

আশায়-আনন্দে বনহুর উচ্ছল হয়ে উঠেছে। এখানেই গভীর জলের তলায় আছে সাত রাজার ঐশ্বর্য। জংলীগণ যা সেদিন গোপন করে রেখেছে গভীর জলমধ্যে।

কিন্তু জলপ্রপাতের ঐ স্থানটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলে মনে হলো। কারণ ঐস্থানে জলরাশি প্রবলভাবে ঘুরপাক খেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে।

গভীর নীল জল।

জলপ্রপাতটির নিকটে পৌঁছতে অনেক বেগ পেতে হলো।

বনহুর তার তিনখানা বোট নিয়ে কোনোক্রমে এসে হাজির হলো সেই স্থানটিতে।

যে স্থানে বনহুর মোটর বোটগুলো রাখলো ঐ স্থানটি জলপ্রপাতের ঠিক এক কিনারে। এখানে স্রোতোচ্ছ্বাস রয়েছে বটে কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর নয়।

বনহুর বোটগুলো সাবধানে রেখে অনুচরদের নিয়ে নেমে পড়লো। নূরী আর নাসরিন নামতে ভয় পাচ্ছিলো, বনহুর হাত বাড়ালো—এসো।

নূরী বনহুরের হাতে হাত রেখে নেমে দাঁড়ালো।

নাসরিনও সখীকে অনুসরণ করলো।

সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলো, জাহাজ থেকে খাবার সঙ্গে আনা হয়েছিলো, পেট পুরে খেলো ওরা।

বনহুর দলবল নিয়ে ঐ জায়গায় এসে দাঁড়ালো। যে স্থান হতে জলপ্রপাতের মধ্যে জংলীগণ নিক্ষেপ করেছিলো সেই রত্নভাণ্ডারগুলো।

নূরী আর নাসরিন শিউরে উঠলো।

গভীর জলোচ্ছ্বাসে সে স্থানটি যেন তোলপাড় হচ্ছে।

কি মারাত্মক ভয়ঙ্কর স্থান ওটা, এখান থেকে কিভাবে সেই গুপ্তরত্ন ভাণ্ডার সিন্দুকগুলো উদ্ধার করা যাবে।

ভীষণ তরঙ্গায়িত জলোচ্ছ্বাসের দিকে তাকিয়ে বনহুর মগ্ন হয়ে কিছু চিন্তা করতে থাকে।

নূরীর বুকটাও ঠিক ঐ তরঙ্গায়িত জলোচ্ছ্বাসের মতই তোলপাড় করছিলো। জাহাজে আসাকালে যে আনন্দ হয়েছিলো সব নিঃশেষ হয়ে গেলো এই মুহূর্তে। বনহুর যখন জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে অবতরণের জন্য ডুবুরী

ড্রেস পরিধান করছিলো শুধু নূরীই নয়, রহমান এবং অন্যান্য সকলেরই মুখে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো।

রহমান বললো—সর্দার, রত্নভাণ্ডারের জন্য এমন ভয়ঙ্কর স্থানে আপনাকে পাঠাতে হবে জানলে আমি কিছুতেই আপনাকে আসতে দিতাম না। বলতে বলতে প্রায় কেঁদেই ফেললো রহমান।

বনহুর সান্ত্বনা দিয়ে বললো—রহমান, মৃত্যু মানুষ মাত্রেরই হবে। যদি মরণ আসে মরবো দুঃখ নেই, তুমি এদের নিয়ে ফিরে যেও। আর যদি ঐ রত্নভাণ্ডার নিয়ে জলোচ্ছ্বাসের মধ্য থেকে উঠে আসতে পারি তাহলে জানো কত উপকার হবে? শত শত জনগণ আজ ক্ষুধার্ত। যাদের দিকে ফিরে চাবার কারো সময় নেই। যাদের কথা ভাববার মত কারো অবসর নেই। রহমান, যদি এসব উদ্ধার করতে পারি তাহলে আমার চিন্তাধারা হয়তো সার্থক হবে।

নূরী জানে, কোনো বাধাই বনহুরকে আজ ক্ষান্ত করতে পারবে না। এই রত্নভাণ্ডারের জন্য আজ সে ছুটে এসেছে হাজার হাজার মাইল দূরে। কতগুলো প্রাণ বিসর্জন হয়েছে, কত কষ্টই না স্বীকার করতে হয়েছে তাদের। প্রচুর অর্থও ব্যয় হয়েছে। কারো কোনো কথাই আজ বনহুরের কানে পৌঁছবে না, সে এই ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে নামবেই নামবে। হয়তো এটাই হবে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত। বনহুরের দিকে নির্নিমেশ নয়নে তাকিয়ে ছিলো নূরী, তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোটা ফোটা অশ্রু।

বনহুর ডুবুরী ড্রেস পরে নিয়ে জলোচ্ছ্বাসে নামার জন্য তৈরি হয়ে নিলো।

রহমান এবং অন্যান্য অনুচরগণ সবাই প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে বনহুরের নির্দেশিত কাজ করার জন্য। ভারী বস্তু উঠানোর মেশিন ফিট করা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে কয়েকজন। কয়েকজন উপরে ওয়্যারলেস যন্ত্র বসানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ বনহুরের দেহে তার ড্রেস ঠিক করে দিচ্ছে! আর কতগুলো অনুচর চারদিকে পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে।

প্রথমে বনহুর পরীক্ষামূলক যন্ত্র নিয়ে জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে নামিয়ে পরীক্ষাকার্য চালালো। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে চললো ফারহান।

অনেক কষ্টে পরীক্ষামূলক যন্ত্র দ্বারা বনহুর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো কোথায় আছে সেই রত্নসম্ভার ভরা লৌহসিন্দুকগুলো।

কিন্তু বনহুর ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের গভীর অতলে অবতরণের পূর্ব মুহূর্তে নূরী হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের বুকে—না না, তুমি যেও না। তুমি যেও না......

নূরী এভাবে আচম্‌কা তাকে বাধা দিয়ে বসবে ভাবতে পারেনি বনহুর, সে তার অনুচরদের সামনে বেশ একটু বিব্রত বোধ করলো। এতোগুলো চক্ষুর সম্মুখে কি বলেই বা নূরীকে সান্ত্বনা দেবে সে।

বনহুর নূরীসহ একটু আড়ালে সরে এলো, নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিলো ওকে, বনহুরের চোখ দুটো ছলছল হয়ে এসেছে, যদি সত্যিই এই যাত্রা তার শেষ যাত্রা হয়। কিন্তু ক্ষণিকের দুর্বলতা বনহুরের। নিজেকে তাড়াতাড়ি সংযত করে নিয়ে বললো—নূরী তুমি দস্যুদুহিতা, এতো সামান্য ব্যাপারে এতো উদ্বিগ্ন হও? এ জন্যই আমি চাইনি তোমাদের আনতে। মুছে ফেলো চোখের পানি, মুছে ফেলো........

নূরী ধীরে ধীরে মুখ তুললো।

বনহুর নিজের হাতে মুছিয়ে দিলো নূরীর চোখের পানি। বললো আবার—তুমি হাসিমুখে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবে, গভীর জলের তলায় সে হাসি আমার জয়যাত্রা সার্থক করে তুলবে।

হুর! খোদা তোমার যাত্রা জয়যুক্ত করুক। চোখে অশ্রু নিয়ে হাসলো নূরী, করুণ ব্যথাভরা সে হাসি।

বনহুর উচ্ছ্বসিত আবেগে নূরীর ওষ্ঠদ্বয়ে এঁকে দিলো গভীর চুম্বন রেখা।

❑

বনহুর তার ডুবুরী ড্রেস পরে অক্সিজেন পাইপসহ মুখোস পরে নিলো, তারপর মোটরবোটে উঠে দাঁড়ালো। রহমান, ফারহান এবং আরও দু'জন অনুচরসহ।

দ্বিতীয় বোটে রইলো গভীর জলের তলদেশ হতে ভারী বস্তু উঠানোর মেশিন এবং হাঙ্গর-কুমীর বা ঐ ধরনের ভয়ঙ্কর জন্তুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার অস্ত্র।

বনহুর যখন জলমধ্যে অবতরণ করবে তখন একবার সে হাত নেড়ে সকলকে অভিনন্দন জানালো।

নূরী আর নাসরিন অশ্রুসিক্ত নয়নে হাত নাড়তে লাগলো।

বনহুর যখন জলোচ্ছাসের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো, নূরী আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না, দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

নাসরিন তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

সর্দার জলমধ্যে অবতরণ করার পর সকলের মধ্যেই একটা উদ্বিগ্নতা এবং চঞ্চলতা দেখা দিলো। যার যার কাজে সবাই তটস্থ্ হয়ে উঠেছে।

রহমান ওয়্যারলেস যন্ত্র ফিট করে বোটে দাঁড়িয়ে আছে। অত্যন্ত পাওয়ারফুল ওয়্যারলেস মেশিন এটা। বনহুর গভীর পানির তলা হতে যা বলছে, সব রহমান স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

ক্ষণে ক্ষণে রহমানের মুখে পরিবর্তন আসছে। জলোচ্ছাসের নিচে বনহুরের অবস্থার উপর নির্ভর করছে রহমানের মুখোভাব। মাঝে মাঝে সেও কথা বলছিলো ওয়্যারলেসে।

রহমান শুনতে পেলো বনহুরের গলা ওয়্যারলেস যন্ত্রে.....রহমান, জলোচ্ছাসের বেগ উপরে যেমন প্রচণ্ড, নিচে তার চেয়ে আরও বেশি......আমার দেহটা যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে.......

রহমান আশঙ্কাভরা গলায় বলে উঠে.......সর্দার, সাবধানে এগুবেন......আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ যেন বিচ্ছিন্ন না হয়......।

বনহুরের গলা......যতদূর সম্ভব সাবধানে এগুচ্ছি, এ জায়গাটার গভীরতা অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে.....আমি এখন পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি নিচে নেমে এসেছি...:.।

সর্দার.....আমরা আশঙ্কিত হয়ে পড়েছি, আপনি কোনো বিপদে পড়েন কিনা, এই চিন্তা হচ্ছে......

রহমান.....এখন জলোচ্ছ্বাসের বেগ কিছুটা কম মনে হচ্ছে.....আমি আরও নিচে নেমে চলেছি......কোনো জলীয় জীবজন্তু এখনও আমার নজরে পড়েনি......কোনো জলীয় উদ্ভিদও দেখছি না......চারদিকে শুধু জলরাশি.....

বোটের উপর ওয়্যারলেসের সম্মুখে উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়িয়ে সর্দারের কথা শুনছিলো রহমান, কথাগুলো যদিও খুব স্বচ্ছ স্পষ্ট নয় তবু সবই বুঝতে পারছিলো এবং মাঝে মাঝে সে জবাব দিচ্ছিলো আগ্রহ সহকারে।

হঠাৎ রহমান শুনতে পায় সর্দারের ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠ......রহমান, আমি এখন আরও নিচে নেমে এসেছি......মিটারে জানতে পারছি, এখন দুশত ফুট গভীর জলের তলে আসতে সক্ষম হয়েছি......এখন আমি দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছি.......এতোক্ষণ প্রবল জলোচ্ছ্বাস ঠেলে আমাকে এগুতে হচ্ছিলো.....তাই নিচে নামতে খুব বেগ পেতে হচ্ছিলো......

একটু পরেই পুনরায় শোনা যায় বনহুরের আনন্দসূচক গলার আওয়াজ...রহমান, আমি সেই রত্নভরা লৌহ...সিন্দুকগুলো দেখতে পাচ্ছি.....।

রহমানের কানে কথাটা পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তার মুখ, অস্ফুট ধ্বনি করে বলে....সর্দার.....রত্নভরা সিন্দুক নজরে পড়েছে.....সর্দার, আপনি সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন.....

হাঁ...রহমান....কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি পৌঁছে যাবো—

রহমানের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো বৈজ্ঞানিক ফারহান। তার হাতে ছিলো বনহুরের অক্সিজেন পাইপের যন্ত্র। এ পাইপ দ্বারা বনহুর গভীর জলের তলায় সচ্ছভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করছিলো। এটা অতি সাবধানে রক্ষা করতে হচ্ছিলো কারণ, এ অক্সিজেন পাইপের উপরই নির্ভর করছে বনহুরের জীবন। হঠাৎ ফারহান অক্সিজেন পাইপের যন্ত্রটা জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে ফেলে দিলো সশব্দে।

সঙ্গে সঙ্গে রহমান আর্তনাদ করে উঠলো—মিঃ ফারহান, একি করলেন?

ফারহান দ্রুতহস্তে রহমানের বুকে রিভলভার চেপে ধরে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো, রহমান যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো মুহূর্তের জন্য।

বনহুরের সমস্ত অনুচর বিস্ময়াহত হয়ে ক্ষণিকের জন্য থ' মেরে গেলো। একি সর্বনাশ করলো সে। সম্বিৎ ফিরে আসতেই আক্রমণ করতে গেলো তারা ফারহানকে, কিন্তু ফারহান রহমানের বুকে রিভলভার চেপে ধরে দাঁতে দাঁত পিষে বললো—আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করলেই তোমরা রহমানকে হারাবে। খবরদার, কেউ নড়বে না।

রহমানের কোনোদিকে তখন খেয়াল নেই, সে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো—সর্দার, সর্দার, সর্দার....

ওয়্যারলেস যন্ত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অক্সিজেন যন্ত্র ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

রহমান দেখলো, দূরে গভীর জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে অক্সিজেন পাইপসহ যন্ত্রটা তলিয়ে গেলো। রহমান ধপ করে বসে পড়লো বোটের উপর, তাকিয়ে দেখলো বুকের কাছে ফারহানের রিভলভারখানা চক্ চক্ করছে।

❑

সুচতুর ফারহান বৈজ্ঞানিক হিসেবেই বনহুরের আস্তানায় স্থান লাভ করেছিলো। রহমানই ওকে আবিষ্কার করেছিলো এবং সর্দারের কাছে ওকে বিশ্বাসী বলে পরিচিত করেছিলো। সে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই বনহুর তাকে স্থান দিয়েছিলো নিজ আস্তানায়।

আসলে ফারহান অতি সুচতুর বুদ্ধিমান এবং দুষ্ট লোক। আরাকান দ্বীপে ছিলো তার বাস। সেও একটি জলদস্যুদলের নেতা বা সর্দার ছিলো, কিন্তু দলের সঙ্গে তার সৎভাব ছিলো না, অনুচরদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতো বলে অনুচরগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো, ওকে হত্যা করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ছিলো তারা! তখন পালাতে বাধ্য হয়েছিলো সে এবং কোনো এক গোপন স্থানে আত্মগোপন করে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেছিলো।

একদিন তার সাধনা সার্থক হলো, দস্যু ফারহান বৈজ্ঞানিক ফারহান নামে পরিচিত হলো, কিন্তু সে আত্মপ্রকাশ করলো না। গোপনে সে সাধনা চালিয়ে চললো।

রহমানের সঙ্গে কোনোক্রমে বৈজ্ঞানিক ফারহানের পরিচয় ঘটে তারপর হয় ঘনিষ্ঠতা। একদিন দলভুক্ত হয় দস্যু বনহুরের।

আজ সেই বৈজ্ঞানিক ফারহান যে হঠাৎ এমন বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে ভাবতেও পারেনি কেউ। রহমান নিজের চেয়ে বেশি বিহ্বল হয়ে পড়লো সর্দারের জন্য।

ওদিকে বনহুরের অনুচরগণ ফারহানের গায়ে হাত দেবার সুযোগ পেলো না। ফারহান হুইসেলে তীব্র আওয়াজ করলো, সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল হতে বেরিয়ে এলো কতগুলো সশস্ত্র দস্যু।

ফারহান রহমানসহ সবগুলো অনুচরকে বন্দী করার জন্য আদেশ দিলো।

নূরী আর নাসরিনকেও বেঁধে ফেললো ফারহান।

নূরীতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো, বনহুরের অবস্থা স্মরণ করে যেন সে স্তব্ধ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলো। কাঁদবার শক্তিও যেন তার লোপ পেয়ে গেছে। চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখছে সে।

ফারহান যখন বনহুরের জীবন-মরণ কাঠি অক্সিজেন পাইপ জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলো তখন নূরী উচ্চস্বরে বলে উঠেছিলো—শয়তান, একি করলি? একি করলি তুই? তারপর ডুকরে কেঁদে উঠেছিলো—হুর, আমার হুর! পরক্ষণেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো তার কণ্ঠ।

ফারহান যখন বনহুরের জাহাজে পথ-প্রদর্শক হিসেবে স্থান পেয়েছিলো তখনই গোপনে পুনরায় যোগাযোগ করে নিয়ে ছিলো তার সেই পুরানো দলের সঙ্গে এবং কিছুসংখ্যক অনুচরকে গোপনে বনহুর ও রহমানের অজ্ঞাতে জাহাজের একটি গোপন খোলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলো।

বনহুর বা রহমানের অবিশ্বাসের কিছু ছিলো না, কাজেই তারা তেমনভাবে জাহাজে কোনো অনুসন্ধান চালায়নি। নিজেদের জাহাজ, তাই নিশ্চিন্ত ছিলো বনহুর।

ফারহান বনহুরের সঙ্গে মোটরবোট যোগে চলে এলেও তার অনুচরদের সতর্ক করে দিয়ে এসেছিলো। ফারহানের আদেশেই তারা বনহুরের অনুচরদের আক্রমণ চালিয়ে বন্দী করে ফেলেছিলো।

বনহুর যখন জলোচ্ছ্বাসে নামার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো ফারহান বনহুরকে সাহায্য করছিলো বটে কিন্তু তার মনে তখন নানারকম দুষ্টামি বুদ্ধি খেয়ে যাচ্ছিলো।

ওদিকে ফারহানের অনুচরগণ জাহাজে বনহুরের অনুচরদের কৌশলে বন্দী করে বোটযোগে এসে হাজির হয়েছিলো সেই স্থানে, যে স্থানে বনহুর তার বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে গুপ্তরত্ন ভাণ্ডারের অনুসন্ধানে এবং উদ্ধারকার্যে ব্যস্ত ছিলো।

ফারহানের অনুচরগণ এবার বনহুরের সবগুলো অনুচরকে বন্দী করে ফেললো। তবে সহজে কাউকে বন্দী করা সম্ভব হয়নি, দু'পক্ষেরই বহু অনুচর নিহত হলো।

রহমান, নূরী আর নাসরিনও বন্দী হয়ে জাহাজে ফিরে এলো।

ফারহান সবাইকে বন্দী করে অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লো—হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ,....তার চোখেমুখে ফুটে উঠলো এক পৈশাচিক ভাব।